ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

২১ জুলাই ২০১৩

**স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়**


**গবেষণা উপদেষ্টা**

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
*চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

ইফতেখারুজ্জামান
*নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

সুমাইয়া খায়ের
*উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
*পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

**গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন**

নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

**গবেষণা সহযোগী**

জহিরুল ইসলাম
শুচিস্মিতা রায়
আহসান রাজিব



**কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন**

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জহিরুল ইসলাম, শুচিস্মিতা রায় ও আহসান রাজিবের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং সাধন কুমার দাস, রেজাউল করিম, ফারহানা রহমান ও শাম্মী লায়লা ইসলাম এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।



**যোগাযোগ**

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

# সূচিপত্র


পৃষ্ঠা

*মুখবন্ধ* *v*

*অধ্যায় এক*
**ভূমিকা** **১**
১.১ প্রেক্ষাপট ১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ১
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ২
১.৪ গবেষণার পরিধি ২
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ২
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো ৩

*অধ্যায় দুই*
**এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্ম-পরিধি** **৪**
২.১ এলজিইডি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৪
২.২ এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন ৫
২.৩ এলজিইডি'র আইনি কাঠামো ৬
২.৪ এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ৭
২.৫ এলজিইডি'র মুখ্য দায়িত্ব ৮
২.৬ এলজিইডি'র কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়া ৯
২.৭ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ১০
২.৮ রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয় ১০
২.৯ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা ১২
২.১০ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১২
২.১১ উপসংহার ১৩

*অধ্যায় তিন*
**এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি** **১৪**
৩.১ প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ ১৪
৩.২ জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম ১৪
৩.৩ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লজিস্টিকস ব্যবহার ১৭
৩.৪ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট) সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং সীমাবদ্ধতা ১৮
৩.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ ১৯
৩.৬ উপসংহার ১৯

*অধ্যায় চার*
**প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা ও অনিয়ম** **২০**
৪.১ এলজিইডি'র প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ২০
৪.২ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা ২১
৪.৩ উপসংহার ২৫

*অধ্যায় পাঁচ*
**প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সমস্যা ও অনিয়ম** **২৬**
৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নঃ কার্যাদেশ প্রদান ও বিল উত্তোলন প্রক্রিয়া ২৬
৫.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ২৬
৫.৩ অন্যান্য সীমাবদ্ধতা ৩৩
৫.৪ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা ৩৪
৫.৫ উপসংহার ৩৬

*অধ্যায় ছয়*
**উপসংহার ও সুপারিশ** **৩৭**
৬.১ উপসংহার ৩৭
৬.২ এলজিইডি'তে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩৭

৬.৩ এলজিইডি'র কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব ৩৮
৬.৪ সমস্যা থেকে উত্তরণে এলজিইডি'র গৃহীত পদক্ষেপ ৪০
৬.৫ সুপারিশ ৪১

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৪৩

**পরিশিষ্ট**

পরিশিষ্ট ১: পরিদর্শনকৃত স্কিম
পরিশিষ্ট ২: এলজিইডি'র অর্গানোগ্রাম
পরিশিষ্ট ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) এলজিইডি'র বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
পরিশিষ্ট ৪: এলজিইডি'তে প্রধান প্রকৌশলীদের তালিকা ও দায়িত্ব পালনের সময়
পরিশিষ্ট ৫: সিজিএ কার্যালয়ে অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়া
পরিশিষ্ট ৬: পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা স্কিমের সংখ্যা
পরিশিষ্ট ৭: প্রকল্প পর্যবেক্ষণের বিবরণ
পরিশিষ্ট ৮: ঠিকাদারের বিল অনুযায়ী সিজিএ কার্যালয়ে ঘুষের হার

**সারণির তালিকা**

সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্যের উৎস ৩
সারণি ২.১: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নযোগ্য রাস্তার পরিমাণ ৫
সারণি ২.২: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নযোগ্য সেতু/কালভার্টের পরিমাণ ৫
সারণি ২.৩: খাতওয়ারি প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড ৯
সারণি ২.৪: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থের উৎস (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) ১০
সারণি ২.৫: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ১০
সারণি ২.৬: এলজিইডির রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত আয় ১১
সারণি ২.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সংখ্যা ১১
সারণি ৩.১: এলজিইডি'র গাড়ির সংখ্যা ১৭
সারণি ৩.২: এলজিইডি'র নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (১৯৯২-২০১২) ১৮
সারণি ৪.১: প্রকল্পের ধারণা তৈরি থেকে অনুমোদন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ২০
সারণি ৪.২: বিভিন্ন অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা এবং তাদের গড় মেয়াদকাল ২৫
সারণি ৫.১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সাপেক্ষে বাস্তবতা ৩১
সারণি ৫.২: ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশন ৩২
সারণি ৫.৩: ঠিকাদারের বিল অনুযায়ী সিজিএ কার্যালয়ে ঘুষের হার ৩৩

**চিত্রের তালিকা**

চিত্র ২.১: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উদ্ভব ৪
চিত্র ২.২: এলজিইডি'র কার্যসম্পাদন কাঠামো ৯
চিত্র ২.৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) এলজিইডি'র বরাদ্দ (কোটি টাকায়) (২০০৩-৪ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত) ১১
চিত্র ৪.১: প্রকল্প পরিকল্পনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ২১
চিত্র ৪.২: উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির নির্ধারিত সময়সীমা (কার্যদিবস ধরে) ২২
চিত্র ৪.৩: প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা ও অনিয়ম ২৪
চিত্র ৫.১: দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির ধরন ৩০
চিত্র ৫.২: আইএমইডি'র সীমিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদাহরণ ৩৫
চিত্র ৫.৩: পরিদর্শন টিম কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা স্কিমের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের হার (২০০৬-২০১২) ৩৫
চিত্র ৬.১: এলজিইডি'তে অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩৯

# মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে টিআইবি।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা, সরকারি ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এলজিইডি'র কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে এলজিইডি'তে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে স্থানীয় সরকার খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'তে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক নাহিদ শারমীন ও শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে তাকে সহায়তা দিয়েছেন জহিরুল ইসলাম, শুচিস্মিতা রায় ও আহসান রাজিব। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল, যাতে এলজিইডি থেকে মূল্যবান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রথমে এলজিইডি'র উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে গবেষণা দলকে এলজিইডি'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। এসব মতামত আবার যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়, এবং হালনাগাদকৃত প্রতিবেদনের ওপর এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের সামনে আরেকটি উপস্থাপনা করা হয়। এভাবে বর্তমান গবেষণার ফলাফল টিআইবি ও এলজিইডি উভয়ের কাছে যৌথভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। টিআইবি'র পক্ষ থেকে এলজিইডি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ এলজিইডি'র সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে, এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

*অধ্যায় এক*

# ভূমিকা

## ১.১ প্রেক্ষাপট

একটি দেশের পল্লী উন্নয়নের সাথে অবকাঠামো উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, যেহেতু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কৃষিপণ্য স্থানান্তর করার ওপর নির্ভর করে পণ্যের মূল্য (সিং, ১৯৮৩)। তবে শুধু কৃষি উন্নয়ন নয়, শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (এলজিআরডি) স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে প্রতিবছর বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ থাকে। দারিদ্র্য নিরসনকল্পে প্রণীত দারিদ্র্য হ্রাস সংক্রান্ত কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো এবং হাট বাজার উন্নয়ন খাতে দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থায়নে এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বলে উল্লিখিত রয়েছে । বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রায় প্রতিবছর অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ছে, যার প্রধান একটি অংশ ব্যয় হচ্ছে এলজিইডি'র মাধ্যমে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপিতে এলজিইডি'র জন্য বরাদ্দ ছিল ৭,৫৬৯ কোটি টাকা।[১]

## ১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

স্থানীয় সরকার খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা স্থানীয় উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ফুজিতা'র (২০১১) গবেষণায় দেখা যায় বিকেন্দ্রীভূত এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলজিইডি কাজ সম্পাদন করে থাকে। দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কারণে কাজের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। সঠিক নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, কাজের বিভাজন, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে এলজিইডি কার্যক্রম সম্পাদন করে বলে ফুজিতা'র (২০১১) গবেষণায় দেখা যায়।

অন্যদিকে এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি নানা ধরনের সমস্যার কথা ফুজিতা (২০১১) সহ কোনো কোনো গবেষণায় উঠে এসেছে (পিএসটিসি, ২০১২; বিডিপিসি, ২০১২; কাদের, ২০১০)। টিআইবি'র একটি গবেষণা (মাহমুদ, ২০০৬) অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দুর্নীতির শীর্ষে ছিল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মোট আর্থিক দুর্নীতির ৩৯.৫%),[২] এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এলজিইডি'র অবস্থান ছিল দ্বিতীয়।[৩] বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে আলোচনাকালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে অপচয়, চুরি ও অব্যবস্থাপনার কারণে উন্নয়ন প্রকল্পের ৪০% অর্থই কাজে আসে না।[৪]

বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে এলজিইডি'র কার্যক্রম নিয়ে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়।[৫] ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি-সংশ্লিষ্ট ১৮৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত

---

[১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন দ্বিতীয় অধ্যায়।

[২] এই প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ছিল ৫২৬ কোটি ২৭ লাখ ২৪ হাজার ৫১৫ টাকা, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ২০৮ কোটি ৯ লাখ ১৭ হাজার ২৫২ টাকা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাহমুদ (২০০৬)।

[৩] *প্রাগুক্ত*। স্থানীয় সরকার উপ-খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি সংঘটিত হয় ইউনিয়ন পরিষদে (মোট ঘটনার ৩২.৬৭%), এবং এরপরই ছিল এলজিইডি (মোট ঘটনার ১৬.৭৩%)।

[৪] *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৬ মে ২০০২।

[৫] এর মধ্যে এলজিইডি'র ওপর প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম, কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের যোগসাজশে অনিয়ম, কাজ সম্পূর্ণ না করে পুরো বিল আদায়, প্রকৌশলীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ধরনের সংবাদ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'সাড়ে নয় কোটি টাকার টেন্ডার ভাগাভাগি', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ মে ২০০৯; 'নওগাঁয় টেন্ডার ভাগাভাগি ওপেন সিক্রেট', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩০ মে ২০০৯; 'বরিশাল এলজিইডিতে সোয়া কোটি টাকার নির্মাণ কাজের টেন্ডারে অনিয়ম দুর্নীতি', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৬ জুন ২০০৫; 'চৌদ্দগ্রামে এলজিইডির ১৩ প্রকল্পের কাজ ভাগাভাগি', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৬ মে ২০০৫; 'ফরিদপুরে টেন্ডার নিয়ে সরকারি

অনিয়ম, দাপ্তরিক দুর্নীতি সংক্রান্ত, ব্যক্তিগত দুর্নীতি (আত্মসাৎ) সংক্রান্ত, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি সংক্রান্ত, উন্নয়নমূলক কাজের মন্থরগতি সংক্রান্ত ও অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় (এলজিইডি, ২০১২: ১৬)। সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনার ভিত্তিতে নির্মাণ-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং বিশাল অংকের অর্থের সংশ্লিষ্টতার কারণে এলজিইডি'কে একটি 'সম্ভাব্য দুর্নীতিপ্রবণ' প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে স্থানীয় সরকার খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'তে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে।

### ১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. এলজিইডি'র আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. এলজিইডি'র কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার কারণ নিরূপণ করা; এবং
৩. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

### ১.৪ গবেষণার পরিধি

গবেষণায় এলজিইডি'র আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, আর্থিক বরাদ্দ, জনবল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এলজিইডি'র প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং এ প্রক্রিয়ায় (যেমন দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি) স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা, এবং এলজিইডি'র কার্যক্রমের নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ এলজিইডি'র সব প্রকল্প এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এলজিইডি'তে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যার ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

### ১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ কৌশল যেমন সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে।

#### *১.৫.১ তথ্যের উৎস*

গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, সাধারণ জনগণ, এবং সাংবাদিক (মোট ১৩৮ জন)। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে এলজিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) ও হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, এলজিইডি থেকে সংগৃহীত তথ্য,[৬] এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিজিএ ও সিএজি'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন, এলজিইডি'র প্রকল্প প্রস্তাবনা, এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

#### *১.৫.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি*

তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ (সারণি ১.১)। এছাড়া এ গবেষণায় এলজিইডি'র বাস্তবায়িত একটি বৃহৎ প্রকল্পকে[৭] কেস

---

দলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে ৭ জন আহত', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৮ অক্টোবর ২০০৯; 'মেহেরপুরে দরপত্র দাখিল নিয়ে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ: আহত ৪', *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ ডিসেম্বর ২০০৯; 'নাটোরে বাক্স ভেঙে ২ লাখ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ টেন্ডার ছিনতাই', *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ আগস্ট ২০০৯; 'ফুলপুরে এলজিইডি'র ২ কোটি টাকার টেন্ডার ভাগাভাগি', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ মে ২০০৯; 'বগুড়ায় ক্ষমতাসীনদের টেন্ডার ডিলার ও দখলবাজি', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৮ অক্টোবর ২০০৯; 'রংপুরে আওয়ামী লীগ-যুবলীগ নামধারীরা বেপরোয়া', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৫ অক্টোবর ২০০৯; 'কোটালিপাড়া বিসিএল ওমন স্ক্র্যাচ টেন্ডার বক্স', *দি ডেইলি স্টার*, ১৩ নভেম্বর ২০০৯; 'রাণীনগরে এলজিইডি'র ২ কোটি ১০ লাখ টাকার টেন্ডার ভাগাভাগি', *দৈনিক সংবাদ*, ২৪ জুন ২০০৫; 'এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় অনিয়ম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত', *দৈনিক সংবাদ*, ৯ মে ২০০৫।

[৬] তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে গবেষণা দলের পক্ষ থেকে এলজিইডি'তে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়।

হিসেবে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের নয়টি উপজেলার ১০৮টি স্কিম পরিদর্শন করা হয় এবং প্রতিটি স্কিম পরিদর্শনের সময় স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করা হয় ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।[৮] এছাড়া একটি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

**সারণি ১.১: প্রাথমিক তথ্যের উৎস**

| তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | তথ্য সংগ্রহের টুল | তথ্যের উৎস | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার | চেকলিস্ট | ▪ এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী<br>▪ পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী<br>▪ সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী<br>▪ ঠিকাদার<br>▪ সাংবাদিক | ১৩৮ জন |
| দলীয় আলোচনা | চেকলিস্ট | ▪ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার (জনগণ, এলসিএস) | সাতটি |
| সরেজমিন পর্যবেক্ষণ | চেকলিস্ট | ▪ বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের ডকুমেন্ট<br>▪ স্থানীয় জনগণ | ▪ নির্ধারিত প্রকল্পের অধীনে নয়টি উপজেলার ১০৮টি স্কিম<br>▪ একটি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প |

### *১.৫.৩ তথ্যের সত্যতা যাচাই, মান নিয়ন্ত্রণ, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ*

মাঠ পর্যায়ের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পাদনা করা হয় এবং এসব তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সার্বক্ষণিকভাবে মাঠে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করা হয়। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন এ বছর ১৮ এপ্রিল এলজিইডি'র উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ৬ থেকে ৮ মে এলজিইডি'র ঢাকা কার্যালয়ে গবেষণা দল এলজিইডি'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করে। এসব মতামত আবার যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয়, এবং ২ জুলাই হালনাগাদকৃত প্রতিবেদনের ওপর আরেকবার উপস্থাপন করা হয়।এভাবে প্রতিবেদনের তথ্যসমূহ এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

### *১.৫.৪ গবেষণার সময়*

২০১০ এর ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৩ এর মে পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

## ১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায়ে রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। এলজিইডির বিবর্তন, উল্লেখযোগ্য অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্মপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত  বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকল্প প্রণয়নে সমস্যা এবং অনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সমস্যা ও অনিয়ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। সবশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এলজিইডি'তে বিরাজমান সমস্যার কারণ-প্রভাব-ফলাফল বিশ্লেষণ এবং এসব সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[৭] এই প্রকল্পের প্রস্তাব ১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (Executive Committee of the National Economic Council – একনেক) সভায় গৃহীত হয়। গৃহীত হওয়ার পর মোট ছয়বার প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। এর বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৭ সালে এবং শেষ হয় ২০০৮ সালের জুন মাসে (বাস্তবায়নের মোট সময় প্রায় ১১ বছর)। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি জেলার ২৬টি উপজেলার অন্তর্গত মোট ৩১৫টি স্কিম বাস্তবায়িত হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়। এ প্রকল্পের মূল বাজেট ছিল ১২৫.৯৫ কোটি টাকা যা সংশোধন করে ৩৪০.৬৫২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, এবং জুন ২০০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৩৩১.৯৭১৩ কোটি টাকা।

[৮] পরিদর্শনকৃত স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ১।

# এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্ম-পরিধি

এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো তদুপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলজিইডি'র কার্যক্রম পর্যালোচনার আগে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং এর কর্ম-পরিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে এলজিইডি'র উদ্ভব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্ম-পরিধি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

## ২.১ এলজিইডি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৯৫৯ সালে পল্লী উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান একাডেমী কাজ শুরু করে, যা কুমিল্লা অঞ্চলে অবস্থিত থাকার কারণে এর ব্যবহৃত মডেলটি 'কুমিল্লা মডেল' নামে পরিচিত ছিল। আখতার হামিদ খান ছিলেন এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা। পল্লী জনগণের উন্নয়ন সাধন ছিল এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। আখতার হামিদ খানের মতে কুমিল্লা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রির দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ছিল যা অনুন্নত অবকাঠামোর কারণে সম্ভব ছিল না।[৯] তখন তাঁর উদ্যোগে কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন করার জন্য কুমিল্লা অঞ্চলকে পাইলট হিসেবে বেছে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই মডেলের মাধ্যমে কুমিল্লা এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের সাথে অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী কৃষকদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য ঋণ এবং সেচের সহায়তা দেওয়া হত।[১০] 'কুমিল্লা মডেল'-এর চারটি শাখা ছিল – দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়-কৃষক সমবায় সমিতি (কৃষক সহযোগী) ও থানা সমবায় সমিতি, রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, থানা সেচ কর্মসূচি, এবং থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র[১১]। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান একাডেমীর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) (Bangladesh Academy for Rural Development)।[১২]

**চিত্র ২.১: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উদ্ভব**

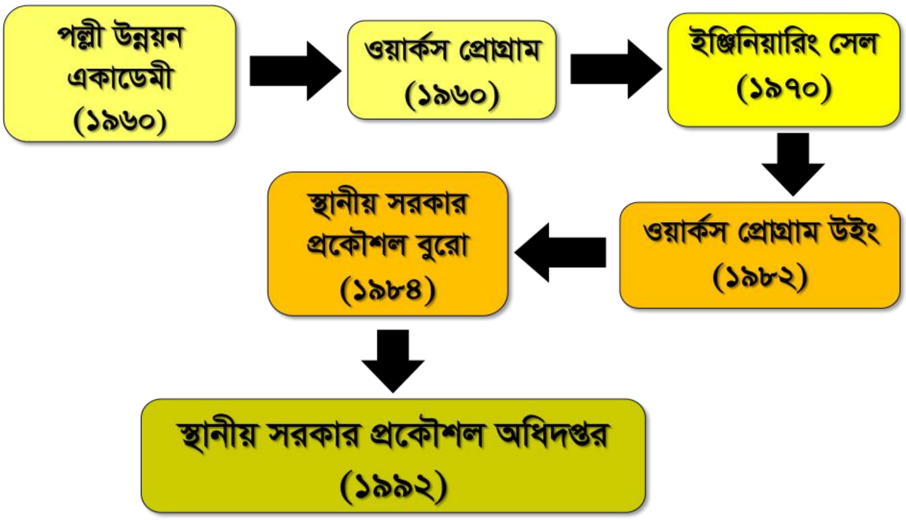


১৯৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি এঞ্জিনিয়ারিং সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল কার্যক্রম ছিল পল্লী পূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) পর্যবেক্ষণ করা। পরবর্তীতে এই সেলের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং' চালু করা হয়। ১৯৮৪ সালে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংকে রাজস্ব বাজেটের অধীনে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো' হিসেবে রূপান্তর করা হয়। কাজের পরিধি, প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং জনবল কাঠামো বৃদ্ধির কারণে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোকে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর' হিসেবে উন্নীত করা হয়।

[৯] http://en.wikipedia.org/wiki/Comilla_Model (১৯ জুন ২০১২)।
[১০] http://www.ahkrc.net.pk/The-Legacy-of-Akhter-Hameed-Khan.html (১৯ জুন ২০১২)।
[১১] http://www.lged.gov.bd/AboutLgedHistory.aspx (১৯ জুন ২০১২)।
[১২] http://en.wikipedia.org/wiki/Comilla_Model (১৯ জুন ২০১২)।

### ২.২ এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

### ২.২.১ অবকাঠামো নির্মাণ

এলজিইডি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিভূত একটি প্রতিষ্ঠান, যার মোট জনশক্তির প্রায় ৯৮% জেলা ও উপজেলা স্তরে কাজ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১২ এর মে পর্যন্ত এলজিইডি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৮২,০৫৭ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে উপজেলা রাস্তা ৩০,২৭০ কি.মি., ইউনিয়ন রাস্তা ৪৪,৭৫১ কি.মি. এবং গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা ২৯,৪৪২ কি.মি. (সারণি ২.১), এবং এসব রাস্তায় ১,১৫৮ কি.মি. (বা ১১,৫৭,৮৯৯ মিটার) সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করেছে (সারণি ২.২)।[১৩]

**সারণি ২.১: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নযোগ্য রাস্তার পরিমাণ**

| রাস্তা | সর্বমোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | বাস্তবায়িত | | বাস্তবায়নযোগ্য (কি.মি.) |
|---|---|---|---|---|
| | | (কি.মি.) | শতাংশ | |
| উপজেলা রাস্তা | ৩৭,৮২২ | ৩০,২৭০ | ৮০ | ৭,৫৫২ |
| ইউনিয়ন রাস্তা | ৪৪,৭৫১ | ২২,৩৪৫ | ৫০ | ২২,৪০৬ |
| গ্রাম অঞ্চলের রাস্তা | ২,১৫,৭৭৫ | ২৯,৪৪২ | ১৪ | ১,৮৬,৩৩৩ |
| **মোট** | **২,৯৮,৩৪৮** | **৮২,০৫৭** | **২৮** | **২,১৬,২৯১** |

এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ১,৭৫৯টি গ্রোথ সেন্টার, ১,৬৬৭টি গ্রামীণ হাট-বাজার নির্মাণ ও উন্নয়ন, ২১,৪৩০ কি.মি. সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৪২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং প্রায় ৪,০২,১৬০ হেক্টর জমিতে কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন নির্মাণ করেছে।[১৪] এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ১.৭ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।[১৫] এছাড়া দেশীয় প্রকৌশলী দ্বারা ঢাকা শহরে খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণের পর মৌচাক-মগবাজার সংযোগস্থল হয়ে মহাখালী পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা এলজিইডি গ্রহণ করেছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের আলোকে দেশের পল্লি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি পল্লি অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।[১৬]

**সারণি ২.২: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নযোগ্য সেতু/কালভার্টের পরিমাণ**

| সেতু/ কালভার্ট | চাহিদা | বাস্তবায়িত | | বাস্তবায়নযোগ্য |
|---|---|---|---|---|
| | দৈর্ঘ্য (মি.) | দৈর্ঘ্য (মি.) | শতাংশ | দৈর্ঘ্য (মি.) |
| উপজেলা রাস্তার উপর | ৪,৫৬,৬৭৫ | ৩৭৬,৭৮৯ | ৮৩% | ৭৯,৮৮৬ |
| ইউনিয়ন রাস্তার উপর | ৪,২২,০৪৩ | ৩১৪,৫০৪ | ৭৫% | ১,০৭,৫৩৯ |
| গ্রাম অঞ্চলের রাস্তার উপর | ৯,১৩,৮৯৫ | ৪,৬৫,৬০৬ | ৫১% | ৪,৪৮,২৮৯ |
| **মোট** | **১৭,৮৮,২৭৬** | **১১,৫৭,৮৯৯** | **৬৫%** | **৬৮৮,৫২** |

উপরোক্ত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কারণে এলজিইডির দাবি মোতাবেক যানবাহন পরিচালনার ব্যয় কমেছে ৪০%, পাট এবং ধানের উৎপাদন বেড়েছে ১৮০%, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা বেড়েছে ৩৭%, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি বেড়েছে ২৪% এবং ছাত্রীদের ৫৯%, এবং শিল্প কারখানা এবং দোকান ২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৭]

### ২.২.২ দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে এলজিইডি'র অর্জন উল্লেখযোগ্য।

- **মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ:** দুঃস্থ ও গরীব মহিলা জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রায় সবগুলো পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গ্রোথ সেন্টার/ হাট-বাজারে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে মহিলাদের জন্য আলাদা দোকানের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা গৃহস্থালী কাজ ছাড়াও আয়-বর্ধক কাজে নিয়োজিত হতে পারেন।
- **সঞ্চয়ী সংগঠন সৃষ্টি:** দেশের সবগুলো জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে দুস্থ মহিলা কর্মীদের দ্বারা গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এ উদ্দেশ্যে স্থানীয় দরিদ্র ও দুস্থ নারীদের নিয়ে এলসিএস (লোকাল কনট্রাকটিং সোসাইটি) গঠন করা হয়। মূলত গ্রামাঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এলসিএস গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সহায়তায় এলসিএসের সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। প্রথমে যারা কাজ করতে

[১৩] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ৫ মে ২০১৩।
[১৪] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ৫ মে ২০১৩।
[১৫] অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৯, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১৩৭।
[১৬] *প্রাগুক্ত*।
[১৭] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ৫ মে ২০১৩।

আগ্রহী তাদের নাম নেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন করা হয়, এবং চুক্তিবদ্ধ করা হয়। এলসিএস'কে তদারকি করার জন্য এলজিইডি থেকে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। চুক্তির অধীনে দৈনিক ভিত্তিতে ভাতা প্রদান করা হয়, এবং দৈনিক ভাতা হতে ৪০% সঞ্চয় হিসেবে আলাদা হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখা হয়। চুক্তি শেষে মহিলা কর্মীরা জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারে, যা তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কিভাবে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

- **প্রশিক্ষণ প্রদান:** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়কে স্থায়ী আয়ে পরিণত করার জন্য তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ অর্থাৎ মৎস্য, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২,১৯৫ জন মহিলা এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের সচেতনতা, জ্ঞান, নারীর মানবিক অধিকার, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চার মাসব্যাপি ব্যবহারিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

### ২.৩ এলজিইডি'র আইনি কাঠামো

এলজিইডি বেশ কয়েকটি আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯' অনুযায়ী এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি, পদোন্নতি এবং নিয়োগ দেওয়া হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া 'পল্লী উন্নয়ন কৌশল', 'নগর ব্যবস্থাপনা নীতিমালা', 'জাতীয় পানি নীতিমালা', 'জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল ২ (সংশোধিত) ২০০৯-১১' এর আলোকে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নকে বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি'র গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি' অনুসরণ করা হয়। নিচে এসব আইন, বিধি ও নীতিমালার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

#### ২.৩.১ *জাতীয় পানি নীতিমালা, ১৯৯৯*

বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় পানি নীতিমালা, ১৯৯৯' অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা চিহ্নিত ১০০০ হেক্টর বা তার নিচের এলাকার প্রকল্প স্থানীয় সরকার বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এলাকার সকল জনগণ পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন, কার্যক্রম পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে, এবং এসব কাজের সমন্বয় করে থাকে স্থানীয় সরকার।

#### ২.৩.২ *জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল-২ (সংশোধিত), ২০০৯-১১*

জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল-২ এ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে এলজিইডি'র ভূমিকা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ উল্লেখ আলোচিত হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া দেশের সড়ক সংযোগ উন্নয়নের জন্য 'জাতীয় যোগাযোগ নীতি' গঠন এবং 'সড়ক মহাপরিকল্পনা' গৃহীত করা এবং সড়ক উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

#### ২.৩.৩ *স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯*

'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯'-এ নয়টি বিধি রয়েছে। বিধি ৩ থেকে বিধি ৭ পর্যন্ত নিয়োগ পদ্ধতি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে সরাসরি নিয়োগ, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ, বদলির মাধ্যমে নিয়োগ এবং প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিধি ৮-এ শিক্ষানবিশের চাকরির সময়সীমা, স্থায়ী করার পদ্ধতি, চাকরি হতে অব্যাহতি প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিধি ৯-এ পূর্বের বিধিমালা রহিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূর্বের বিধিমালার অধীনে যেসকল কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে তা এই বিধির মাধ্যমে গৃহীত বলে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া তফসিলে ৪১টি পদের নিয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং যেসব পদে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হবে তার সর্বোচ্চ বয়সসীমা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

#### ২.৩.৪ *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮*

'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬'-এর অধীনে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' প্রণয়ন করা হয়। এলজিইডি'র অধীনে সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রয় থেকে শুরু করে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রয় 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুযায়ী হয়ে থাকে।

এই বিধিমালায় নয়টি অধ্যায় এবং ১৩০টি বিধি রয়েছে। বিধিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দরপত্র প্রস্তুত, দরপত্রদাতা কর্তৃক সকল সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক সেবার মূল্য নির্ধারণের অনুসরণীয় বিধান, দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির গঠন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির গঠন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা, এবং দরপত্র অনুমোদন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন অর্থাৎ একটি কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণ প্রভৃতি এবং ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন, নিরাপত্তা জামানত, দরপত্র বাতিল করা, দরপত্র বাতিল পরবর্তী গৃহীতব্য ব্যবস্থা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, পরামর্শক সেবা সংক্রান্ত চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, ক্রয়কার্যের রেকর্ড পুনরীক্ষণ, ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা, ক্রয়কারী কর্তৃক যোগ্যতাসম্পন্ন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারদের তালিকা সংরক্ষণ, সহ-ঠিকাদার বা সহ-পরামর্শক নিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য ও ভৌত সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি, সীমিত দরপত্র পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এলজিইডি'র পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ও কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রধানত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এবং সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে দরপত্র আহ্বানের জন্য বিজ্ঞাপন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন প্রভৃতি ক্রয়ের প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ, প্রাক-যোগ্যতার আবেদনপত্রের মূল্যায়ন, দরপত্র উন্মুক্তকরণ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগত সেবা ক্রয় পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ক্রয়কারী বা ক্রয়কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি যদি পেশাগত অসদাচরণ ও অপরাধের সাথে জড়িত না হওয়া ও জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয়, পরিবীক্ষণ সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

#### *২.৩.৫ সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধিমালা, ১৯৮২*

সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি অনুযায়ী সচিব/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান (যারা যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার নিচে নন) তারা সার্বক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত ও অফিসের কাজে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। সরকারি কাজে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক গাড়ি ব্যবহার, সরকারি গাড়িতে উপজেলা পরিদর্শন, সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক ব্যবহার, সরকারি গাড়ির নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া এলজিইডি'র জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি ও নীতিমালা, যেমন আউটসোর্সিং নীতিমালা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

### ২.৪ এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাঠামো সারা দেশ বিস্তৃত। এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত, এবং এখানে ১৪টি ইউনিট রয়েছে – পরিকল্পনা, ডিজাইন, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেনশন সিস্টেম, নগর ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সড়ক নিরাপত্তা, ক্রয় কার্যক্রম, এবং তথ্য ইউনিট। এসব ইউনিটের মাধ্যমে এলজিইডি সব কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এলজিইডি'র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন একজন প্রধান প্রকৌশলী, যাঁর অধীনে পাঁচজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কর্মরত; তাদের মধ্যে স্থায়ী তিনজন এবং অস্থায়ী দুইজন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের অধীনে দশজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্মরত, যাঁরা প্রতিটি ইউনিটের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া সদর দপ্তরে ৩৬ জন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্মরত। ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের বাইরে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা এবং ৪৮৩টি উপজেলায় এলজিইডি'র কার্যালয় রয়েছে।[১৮]

#### *২.৪.১ জনবল*

এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৩-এর মে পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটের অধীনে ১১,০৬৮ জন কর্মরত; এর মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ২১৮ জন (মোট জনবলের ১.৯৭%), বিভাগীয় পর্যায়ে ২৮ জন (মোট জনবলের ০.২৫%), ১৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২৬ জন (মোট জনবলের ১.১৪%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২ জন (মোট জনবলের ১১.৫৮%), এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২১০ জন (মোট জনবলের ৮৩.২১%) কর্মরত। অর্থাৎ এলজিইডি'র মোট জনবলের ৯৮% মাঠ পর্যায়ে কর্মরত।[১৯]

এলজিইডি'র প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বে একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এবং তার অধীনে নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট আটজন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। প্রতিটি জেলা সদরে নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে দুইজন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া পুরানো বৃহত্তর জেলাগুলোতে একজন করে মেকানিক্যাল প্রকৌশলী রয়েছেন। প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সহকারী উপজেলা প্রকৌশলীসহ মোট ১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

---

[১৮] এলজিইডি'র অর্গানোগ্রামের জন্য দেখুন http://www.lged.gov.bd/ (৮ এপ্রিল ২০১৩) এবং পরিশিষ্ট ২।

[১৯] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৮ মে ২০১৩।

২.৪.২ *নিয়োগ*
এলজিইডি'তে রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়।

**২.৪.২.১ রাজস্ব বাজেটের অধীনে নিয়োগঃ** রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সরকারি কর্ম-কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে চারভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়: (১) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে, (২) পদোন্নতির মাধ্যমে, (৩) বদলির মাধ্যমে, এবং (৪) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

এলজিইডি'র নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী কোনো পদে তার সম-পদমর্যাদাসম্পন্ন ও একই ধরনের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন পদের পদাধিকারীদের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে।[২০] পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমত, নির্ধারিত পরীক্ষা, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে গঠিত বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে,[২১] এবং দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির চাকরির কার্যক্রম সন্তোষজনক না হলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।[২২]

- ***প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ:*** সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীকে নির্ধারিত পরীক্ষা, মেধা, এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক বিভাগীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৩] প্রধান প্রকৌশলীর বয়স ৫৯ বছর হওয়া পর্যন্ত এবং মুক্তিযোদ্ধা হলে অতিরিক্ত দুই বছর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে কমপক্ষে তিন বছরের চাকরিসহ প্রথম শ্রেণীর পদে কমপক্ষে ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে এই পদের তিন বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা শিথিল করা যেতে পারে।
- ***সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও কম্পিউটার প্রোগ্রামার নিয়োগ:*** সিস্টেম অ্যানালিস্ট ও কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়।[২৪] এছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে এলজিইডি নিয়োগ দিয়ে থাকে।

**২.৪.২.২ উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগঃ** এলজিইডি কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন বাজেটের অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবনার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-ভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। 'সরকারি প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুযায়ী পরামর্শক এবং 'নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯' অনুযায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ড্রাইভার প্রভৃতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এলজিইডি'র প্রশাসন শাখার মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে এই নিয়োগের জন্য পৃথক কোনো বিধিমালা নেই।

**২.৪.২.৩ পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ** এলজিইডি'র চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সরকারি প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী পরামর্শক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনাবিদ, গভর্নেন্স বিশেষজ্ঞ, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম বিশেষজ্ঞ অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষেত্রে এলজিইডি এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (Expression of Interest - EOI) আহ্বান করে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। এরপর এলজিইডি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাংগঠনিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচিত করে এবং তাদের কাছ থেকে কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবনা (Technical Proposal) ও আর্থিক প্রস্তাবনা (Financial Proposal) আহ্বান করে এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করার পর আর্থিক প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করে। এরপর এলজিইডি কর্মকর্তা দ্বারা প্রস্তাবনাগুলো বিশ্লেষণ করার পর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়। এরপর এসব প্রতিষ্ঠান ডেকে সভা করা হয়। প্রকল্প পরিকল্পনার শর্ত (Terms of Reference) অনুযায়ী এলজিইডি কাজ করে থাকে।

**২.৫ এলজিইডি'র মুখ্য দায়িত্ব**
এলজিইডি'র প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে[২৫]:
- পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ;

[২০] *স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯*, বিধি ৬।
[২১] তবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর কোনো পদে কমিশনের সুপারিশ ছাড়া পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে না।
[২২] *স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯*, বিধি ৫ (১) (২)।
[২৩] *স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯*, বিধি ৫ (১) (২) এবং তফসিল দ্রষ্টব্য।
[২৪] *The Computer Personnel (Government & Local Authorities) Recuritment Rules, 1985* দ্বারা।
[২৫] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০১২, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-১২*, পৃ ১-২।

- গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ইউনিয়ন, উপজেলা ও পৌরসভা প্ল্যানবুক, ম্যাপিং ও সড়ক এবং সামাজিক অবকাঠামোর ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ;
- ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগী, ঠিকাদার ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ডিজাইন ও অন্যান্য কারিগরি মডেল, ম্যানুয়েল ও স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন; এবং
- এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

খাত হিসেবে বিবেচনা করলে এলজিইডি প্রধানত তিনটি খাত - গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের কাজ করে থাকে (সারণি ২.৩)।

**সারণি ২.৩: খাতওয়ারি প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড[২৬]**

| গ্রামীণ অবকাঠামো | নগর অবকাঠামো | ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন |
|---|---|---|
| ▪ সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন<br>▪ সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ<br>▪ গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়ন<br>▪ ঘাট/ জেটি নির্মাণ<br>▪ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ<br>▪ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ<br>▪ ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ<br>▪ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি<br>▪ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি<br>▪ কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন<br>▪ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ | ▪ সড়ক/ ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ<br>▪ নর্দমা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ<br>▪ বাস/ ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ<br>▪ বাজার উন্নয়ন<br>▪ টাউন সেন্টার নির্মাণ<br>▪ স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ<br>▪ টিউবওয়েল স্থাপন<br>▪ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি<br>▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা<br>▪ বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম<br>▪ নগর পরিচালনা উন্নতিকরণ<br>▪ দারিদ্র্য বিমোচন<br>▪ নগর প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি | ▪ বাঁধ নির্মাণ<br>▪ স্লুইস গেট নির্মাণ<br>▪ রাবার ড্যাম নির্মাণ<br>▪ খাল খনন ও পুনঃ খনন<br>▪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ<br>▪ স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে বিভিন্ন কারিগরি ও জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান |

এছাড়াও এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে, যেমন পৌরসভার দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, জেন্ডার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত, এবং নগরের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি।

### ২.৬ এলজিইডি'র কার্য-সম্পাদন প্রক্রিয়া

এলজিইডি'র সব কাজ প্রকল্পভিত্তিক। এসব প্রকল্প স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারণ করা হয়, এবং এগুলোর আর্থিক বরাদ্দের উৎস বার্ষিক রাজস্ব বরাদ্দ এবং বৈদেশিক সহায়তা। বরাদ্দ পাওয়ার পর এলজিইডি ১৪টি ইউনিটের সমন্বয়ে আঞ্চলিক, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের সহায়তায় কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে।

**চিত্র ২.২: এলজিইডি'র কার্যসম্পাদন কাঠামো**

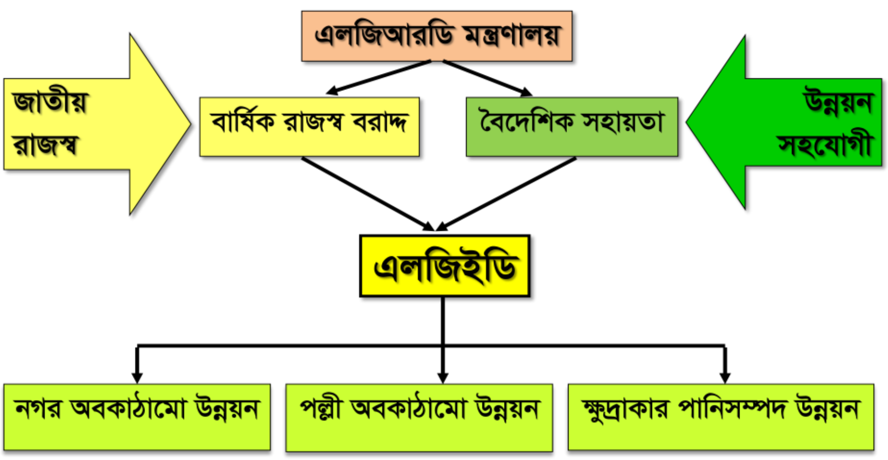


[২৬] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০০৯, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৮-০৯*, পৃ. ৩।

**২.৭ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য**
২০১১-১২ অর্থবছরে ৮২টি[২৭] প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, এবং একই অর্থবছরে এলজিইডিতে এডিপি'র বরাদ্দ ছিল ৪,৩৫০.৮২ কোটি টাকা।[২৮] ২০১০-১১ অর্থবছরে এলজিইডি ৭৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩,৮৮৩ কোটি টাকা।[২৯]

২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৩৫টি (৬১%) ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২২টি (৩৯%), এবং মোট বরাদ্দের ৬২% ছিল বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত এবং ৩৮% বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রাপ্ত। ২০১১-১২ অর্থবছরে এসে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা মোট প্রকল্পের ৭৫.৬% ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৪.৪%, এবং মোট বরাদ্দের ৬৭.৪% বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত এবং বাকি ৩২.৬% বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রাপ্ত (সারণি ২.৪)।

**সারণি ২.৪: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ও অর্থের উৎস (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)**

| অর্থবছর | বাংলাদেশ সরকার | | উন্নয়ন সহযোগী | |
|---|---|---|---|---|
| | প্রকল্পের সংখ্যা | মোট বরাদ্দের অংশ (%) | প্রকল্পের সংখ্যা | মোট বরাদ্দের অংশ (%) |
| ২০০৬-০৭ | ৩৫ | ৬২ | ২২ | ৩৮ |
| ২০০৭-০৮ | ৩২ | ৬১ | ২৫ | ৩৯ |
| ২০০৮-০৯ | ৪৪ | ৫৮ | ২২ | ৪২ |
| ২০০৯-১০ | ৪৫ | ৫৯ | ২৪ | ৪১ |
| ২০১০-১১ | ৫১ | ৬৮ | ২৪ | ৩২ |
| ২০১১-১২ | ৬২ | ৬৭.৪ | ২০ | ৩২.৬ |

*তথ্যসূত্র:* ২০০৬ - ২০১২ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

যেসব উন্নয়ন সহযোগী এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগী হিসেবে অস্ট্রেলিয়া (AusAid), জাপান (JBIC, JICA), জার্মানি (GIZ), নরওয়ে (NORAD), কানাডা (CIDA), সুইডেন (SIDA), এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইফাদ (IFAD), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), জাতিসংঘ জরুরি শিশু তহবিল (UNICEF), ইউরোপিয়ান কমিশন (EC), এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ওপেক (OPEC), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) উল্লেখযোগ্য।

এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে এলজিইডি (সারণি ২.৫)।

**সারণি ২.৫: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প**

| মন্ত্রণালয় | অর্থবছর | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ | ২০০৯-১০ | ২০১১-১২ |
| কৃষি | ৫ | ৩ | ২ | ২ | ৩ |
| মৎস্য | ১ | ১ | ১ | ১ | |
| পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক | ৫ | ৫ | ২ | ১ | ১ |
| পানিসম্পদ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| প্রাথমিক ও গণশিক্ষা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৫ |
| **মোট** | **১৭** | **১৭** | **১২** | **১০** | **১১** |

*তথ্যসূত্র:* ২০০৬ - ২০১২ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

**২.৮ রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়**
এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে। রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে রয়েছে ফার্ম ও কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন ফি, লাইসেন্স ফি (নতুন ও নবায়ন), দরপত্র ও শিডিউল বিক্রি, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফি, যানবাহন/ রোড রোলার ভাড়া, ঠিকাদারি কাজে আরোপিত জরিমানা ও দণ্ড ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫৮.৭২৫ কোটি টাকা এবং রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৭৬.৫৮৩ কোটি টাকা। দেখা যায় গত দুই অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বেশি (সারণি ২.৬)।

[২৭] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১২, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১-১২, পৃ. ২৫।
[২৮] পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০১২, *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)*, ২০১১-১২।
[২৯] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১১, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১০-১১, পৃ. ১৬।

**সারণি ২.৬: এলজিইডির রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত আয়**

| অর্থ বছর | রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত আয় (কোটি টাকা) |
|---|---|---|
| ২০০৬-০৭ | ১১০ কোটি টাকা | ১০২.২৪ কোটি টাকা |
| ২০০৭-০৮ | ১১২.২ কোটি টাকা | ৯৮.১২ কোটি টাকা |
| ২০০৮-০৯ | ১০৬.১৪ কোটি টাকা | ১১২.০১ কোটি টাকা |
| ২০০৯-১০ | ১৪৬.৫৩ কোটি টাকা | ১৩১.৫৭ কোটি টাকা |
| ২০১০-১১ | ১৩৫.০৯ কোটি টাকা | ১৪৪.৮৩ কোটি টাকা |
| ২০১১-১২ | ১৫৮.৭২৫ কোটি টাকা | ১৭৬.৫৮৩ কোটি টাকা |

*তথ্যসূত্র:* ২০০৬ - ২০১২ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

**চিত্র ২.৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) এলজিইডি'র বরাদ্দ (কোটি টাকায়) (২০০৩-৪ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত)**[৩০]

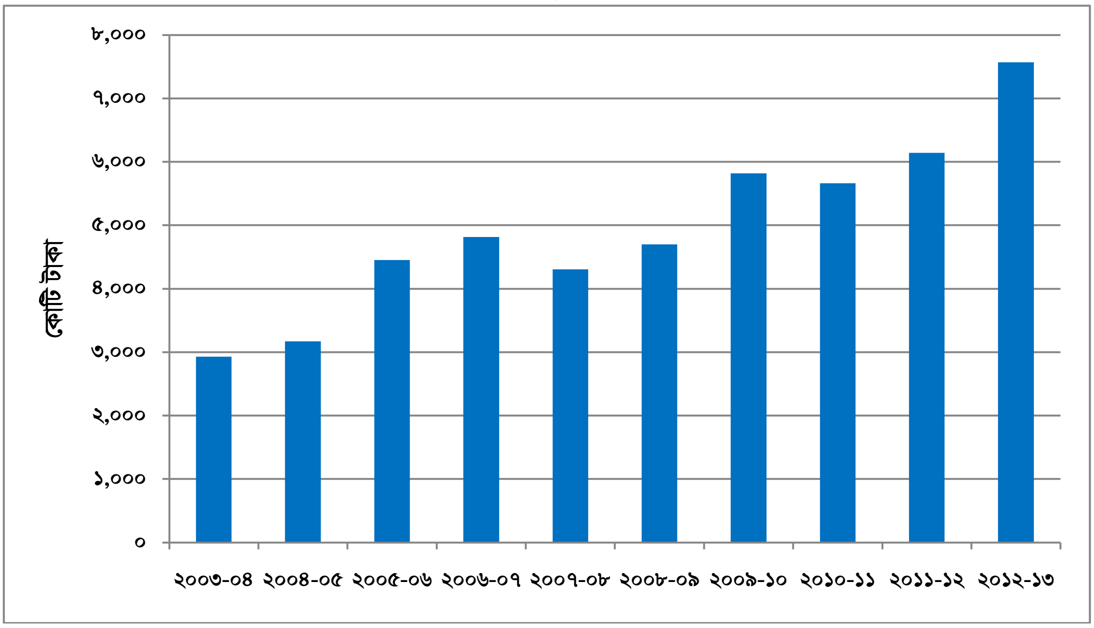


এলজিইডি'র রাজস্ব ব্যয় হচ্ছে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪,৪৭৯.৭৯ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ছিল ৪,৪৪১.০৪ কোটি এবং অনুন্নয়ন বাজেট ৩৮.৭৫ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে ৪,৯৩৪.৩৩ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ৪,৯০৪ কোটি এবং অনুন্নয়ন বাজেট ৩০.৩৩ কোটি টাকা। দেখা যাচ্ছে বিগত অর্থবছরগুলিতে এডিপি'তে এলজিইডি'র উন্নয়ন বরাদ্দের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির প্রবনতা রয়েছে। (চিত্র ২.৩)। আরও দেখা যাচ্ছে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদের শেষের বছরগুলোতে উন্নয়ন বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

এলজিইডি ২০০৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ৬২টি প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হয়। এসব প্রকল্পের মোট বাজেট ২০,৫০৩ কোটি টাকা (সারণি ২.৭)।

**সারণি ২.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সংখ্যা**

| অর্থবছর | বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা | প্রকল্পের ব্যয় (কোটি টাকা) |
|---|---|---|
| ২০০৬-০৭ | ৭ | ২,০৫১ |
| ২০০৭-০৮ | ৯ | ২,৩২৯ |
| ২০০৮-০৯ | ৯ | ১,৫৯৩ |
| ২০০৯-১০ | ১১ | ৪,৭৭৫ |
| ২০১০-১১ | ১৩ | ৩,৯৮৮ |
| ২০১১-১২ | ১৩ | ৫,৭৬৭.৪৮৫ |

*তথ্যসূত্র:* ২০০৬ - ২০১২ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৩।

### ২.৯ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা
এলজিইডি'র যাবতীয় আর্থিক কার্যক্রম দুইভাবে নিরীক্ষা করা হয় - অভ্যন্তরীণভাবে এবং বাহ্যিকভাবে।

#### ২.৯.১ *অভ্যন্তরীণ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা*
এলজিইডি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করার জন্য একটি অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সেল রয়েছে। দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি দল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

#### ২.৯.২ *বাহ্যিক আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা*
এলজিইডি'র বাহ্যিক আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা দুইভাবে করা হয়: হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় হতে নিরীক্ষা।

**২.৯.২.১ *হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (সিজিএ) হতে নিরীক্ষা:*** সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হচ্ছে সিজিএ'র দায়িত্ব। বরাদ্দ, মঞ্জুরি এবং আইন পর্যালোচনা করে, এবং প্রতিটি বিল যাচাই করে সিজিএ কার্যালয় অর্থ ছাড় করে থাকে। সিজিএ কার্যালয় শুধু সরকারের যে আয় হয় এবং সেই আয় থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বা রাজস্ব বাজেটের অধীনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে বেতন-ভাতা দেওয়া হয় তার হিসাব রাখে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের কোনো হিসাব তারা রাখে না। এলজিইডি'তে সরকারি অর্থায়নে যখন কোনো প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয় তখন তার হিসাব সিজিএ অফিস রাখে। সিজিএ সারাবছর নিরীক্ষা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো প্রকল্পের বিল জমা দেওয়ার পর ক্যাশ শাখা আইডি নম্বরের জন্য প্রাথমিক এন্ট্রি দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট অডিটর এবং সুপারিটেন্টডেন্টের মাধ্যমে যাচাই ও পুনঃযাচাইয়ের পর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা চেক সই করে থাকে।[৩১]

**২.৯.২.২ *মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) হতে নিরীক্ষা:*** আইন অনুযায়ী সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) ওপর ন্যস্ত।[৩২] সিএজি কার্যালয় থেকে এলজিইডি'র কার্যক্রম তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়:
- *বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (Foregin Aided Project Audit Directorate - FAPAD)*: এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত সব বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা করে থাকে। এই অধিদপ্তর সারাবছর নিরীক্ষা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সরাসরি এবং কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে থাকে।
- *পূর্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর (Works Audit Directorate)*: জেলা পর্যায়ের এলজিইডি'র কার্যালয় ও এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত জেলা পর্যায়ের সব সরকারি কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়। একটি প্রকল্পের কাজ শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত যেকোন সময় এই অধিদপ্তর নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে থাকে।
- *স্থানীয় এবং রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (Local & Revenue Directorate)*: উপজেলা পর্যায়ের এলজিইডি কার্যালয় ও এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়। এই অধিদপ্তর সারাবছর নিরীক্ষা করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো সরাসরি এবং কাগজপত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

### ২.১০ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
এলজিইডি'র নিজস্ব 'প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট', পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' (আইএমইডি) এবং সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে। প্রত্যেক অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ছয়টি পরিদর্শন দল, দশটি অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত দশটি পরিদর্শন দল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (স্কিম) সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।[৩৩]

অন্যদিকে আইএমইডি থেকে দুইভাবে মূল্যায়ন করা হয় - কার্য-সম্পাদন মূল্যায়ন এবং প্রভাব মূল্যায়ন। কোনো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে কার্য-সম্পাদন মূল্যায়ন বলা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিটি প্রকল্পের কার্য-সম্পাদন মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে কোনো প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার তিন থেকে চার বছর পর যখন ঐ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয় তখন তাকে প্রভাব মূল্যায়ন বলা হয়। খুব অল্প সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। মূলত কোনো প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এলজিইডি প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন আইএমইডি'তে পাঠায়। সেই প্রতিবেদনের সাথে

---

[৩১] অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়া জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৫।

[৩২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১২৮(১); *মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন*, ১৯৭৪, ধারা ৫ ও ৬।

[৩৩] পরিদর্শনকৃত স্কিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৬।

জেলার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রকল্প প্রস্তাবনার ওপর তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে আইএমইডি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

### ২.১১ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে এলজিইডি বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন (এলজিআরডি) ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন একটি বিকেন্দ্রিভূত প্রতিষ্ঠান, যার কাঠামো উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধানত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেওয়া ও পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা, এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশাল জনবল নিয়ে এটি কাজ করে। এলজিইডি'র কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক, এবং এসব প্রকল্প বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এলজিইডি'র আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে নিরীক্ষা করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র কার্যক্রম কিভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

*অধ্যায় তিন*

# এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

এলজিইডি বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফুজিতা'র (২০১১) গবেষণায় সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গবেষণায় দেখানো হয়েছে বিকেন্দ্রীভূত এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলজিইডি কাজ সম্পাদন করে থাকে। দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কারণে কাজের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। সঠিক নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি,কাজের বিভাজন, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতির মাধ্যমে এলজিইডি কার্যক্রম সম্পাদন করে।

কিন্তু বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র কার্যক্রম কিভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

### ৩.১ প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ

প্রধান প্রকৌশলীর পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত থেকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পদসোপান[৩৫] অনুযায়ী এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী তাঁর যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এলজিইডি'র প্রত্যেক প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া একজন প্রধান প্রকৌশলী ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কাজেও এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহার করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য পাওয়া যায় (দেখুন বক্স ১)।

**বক্স ১: প্রধান প্রকৌশলীর দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড**

এলজিইডি'র একজন প্রধান প্রকৌশলী বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৩৪] এই নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশের এলজিইডি'র আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় তাঁর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে তিনি একজন মন্ত্রীর সাথে একটি দলীয় রাজনৈতিক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত জনগণকে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে মন্ত্রীর দলকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান। মন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় একটি নদীর ওপর একটি সেতুর নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়ন সমন্বয় সভায় প্রধান প্রকৌশলী বক্তব্য দেন। এছাড়া অন্য একটি জেলার একটি উপজেলার পাঁচটি এলাকায় তিনি সংবর্ধনা গ্রহণ করেন, যেখানে প্রতিটি অনুষ্ঠানে নবম সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

*সূত্র: এলজিইডি'র একজন উর্ধ্বতন প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার*, ২ মার্চ ২০১১; *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জুলাই ও ২২ এপ্রিল ২০১২

এছাড়া এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী পদের নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ করা নেই। এলজিইডি'তে ১৯৯২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ছয়জন প্রধান প্রকৌশলী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। দেখা যায় তাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিই সাত বছরের বেশি সময় এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (পরিশিষ্ট ৪)।

### ৩.২ জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম

রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে এলজিইডি'তে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং এ দুই ধরনের নিয়োগেই সমস্যা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়।

---

[৩৪] উল্লেখ্য, 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯' অনুযায়ী (বিধি ২৫) কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো রাজনৈতিক দল বা এর কোনো অঙ্গসংগঠনের সদস্য হওয়া বা কোনোভাবে এ ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া, বা দেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার অনুমতি নেই।

[৩৫] বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যেসব প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে শুধু এলজিইডি ছাড়া বাকি সবগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত একজন কর্মকর্তা। এছাড়া ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স-এ সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এবং হাউজিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রকৌশলীর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর কোনো অবস্থান উল্লেখ করা হয়নি। তবে যেকোনো সরকারি বিভাগ বা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অবস্থান তালিকার ২২ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_ precedence_for_the_People's_Republic_of_Bangladesh (২১ জানুয়ারি ২০১৩)।

### ৩.২.১ *জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা*

'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা এবং কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৯' অনুযায়ী এলজিইডি'তে নিয়োগ দেওয়া হয়। সরাসরি নিয়োগ (পিএসসি'র মাধ্যমে), পদোন্নতি, বদলি এবং প্রেষণে বদলির মাধ্যমে এলজিইডি'তে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে এলজিইডি'তে বর্তমানে সহকারী প্রকৌশলীর ২০% ও সমাজবিজ্ঞানীর ৮২.৮% পদ এখনো শূন্য রয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের অধীনে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সর্বশেষ নিয়োগ হয় ২০১৩ সালে। সরকারি কর্ম-কমিশন প্রথম শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে যা সময়সাপেক্ষ। এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হাইকোর্টে কেস চলাকালীন নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। তিন মাসের স্থগিতাদেশ নিয়ে সার্ভেয়ার এবং ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এমএলএসএস নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

### ৩.২.২ *উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম*

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়।[৩৬] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কোম্পানির (Outsourcing) মাধ্যমে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। তবে প্রকল্প-ভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা যায় তা নিম্নরূপঃ

১. প্রকল্পের কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য এলজিইডি'তে কোনো পৃথক নিয়োগ নীতিমালা নেই।
২. বেশিরভাগ প্রকল্প পরিকল্পনায় সংশোধনের মাধ্যমে কাজের আওতা বাড়ানো হয় ও সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়, ফলে প্রকল্পের অধীনে কর্মী নিয়োগ এবং সময়সীমাও পরিবর্তিত হয়।
৩. এলজিইডি'তে প্রকল্পগুলোর অধীনে কতজন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা থাকে না এবং এক প্রকল্প শেষ হলে অন্য প্রকল্পে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এক প্রকল্প থেকে অন্য প্রকল্পে নিয়োগের জন্য এসব কর্মীদের কোনো নিয়োগ পরীক্ষা দিতে হয় না। তথ্যদাতাদের মতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক জটিল এবং নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করলে ছয় মাস প্রয়োজন হয়।

### ৩.২.৩ *নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা*

উন্নয়ন খাতে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এলজিইডি'তে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর একটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হত। ফলে দেখা যায়, এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এলজিইডি'র অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে দশ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত কাজ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের যখন নতুন কোনো প্রকল্পে নিয়োগ না দিয়ে চাকরির মেয়াদ শেষ বলে ঘোষণা করা হয় তখন তারা রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হওয়ার জন্য হাইকোর্টে মামলা করে। হাইকোর্ট তাদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করার জন্য অনুমতি দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করা হয়, এবং আপিলে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকে। এভাবে উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন খাত থেকে ৮৫০ জনকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে ১২টি মামলার বিপরীতে ৯৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু পদ শূন্য না থাকায় ২৩১ জন ড্রাইভারকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। মামলার রায়ে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ৫০টি মামলার বিপরীতে ২,৭৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়। এলজিইডি'তে তাদের নিয়োগ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া ২০টি মামলা হাইকোর্টে চলমান রয়েছে।[৩৭]

### ৩.২.৪ *পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি*

***পদায়ন:*** সুবিধাজনক জেলা বা উপজেলায় পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ এবং প্রধান প্রকৌশলীর ক্ষমতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয় সম্পূর্ণ প্রধান প্রকৌশলীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় অথবা এলজিইডি'র নিজস্ব কোনো বিধি, নীতিমালা বা কমিটি নেই – প্রধান প্রকৌশলীর সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পদায়ন করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র কোনো সহকারী প্রকৌশলী/ থানা প্রকৌশলীকে নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্বে) পদে নিয়োগ বা বদলির প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হয়।[৩৮]

এছাড়া ২০১২ সালে আগস্টে ১৮৩৭ জনকে করে রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয়। প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র ছাড়াই এই কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয়। গত ২০ থেকে ২৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতের শূন্য পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত দশ বছরে বেশ কয়েকবার এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, কিন্তু অনিয়ম ও বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে প্রতিবার তা নাকচ করে দেওয়া হয়। দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে প্রায় তিন হাজার জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে রাজস্ব খাতে নিয়মিত করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দুই হাজার ৬৮২

---

[৩৬] দেখুন এ প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

[৩৭] এলজিইডি'র আইন শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (১৮ মার্চ ২০১৩)।

[৩৮] স্থানীয় সরকার বিভাগের পদোন্নতি বা পদায়ন সংক্রান্ত [এস-৫/১সি-৪/৮৫/২৮৯ (৫২৬)] স্মারকের ৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত।

কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা পাঠানো হয়, সেখান থেকে ৮৪৫ জনকে বাদ দেওয়া হয়।[৩৯] এলজিইডি'র ভাষ্য অনুযায়ী জরুরি উন্নয়নকাজের প্রয়োজনে প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতের শূন্য পদে স্থানান্তরের প্রচলিত নিয়মে আপাতদৃষ্টিতে কিছু ব্যত্যয় হলেও তখন অপরিহার্য ছিল। প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে তাঁদেরকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা বর্তমানে যুক্তিসংগত হবে না এবং এতে দক্ষ জনবলের শূন্যতাসহ নানা জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এলজিইডি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান।

***বদলি:*** বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় অথবা এলজিইডি'র নিজস্ব কোনো কমিটি নেই। গবেষণার অনুসন্ধানে দেখা যায়, বদলির ক্ষেত্রে তদবির, ঘুষ বা রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের চাহিদা মেটানোর জন্য মূলত কর্মীদের একস্থান হতে অন্যস্থানে বদলি করা হয়। কোনো কর্মকর্তা যদি রাজনৈতিক নেতাদের চাহিদা মেটাতে না পারে তাহলে তাকে আবার বদলি করা হয়, এবং যে এই চাহিদা মেটাতে পারবে তাকে বদলি করে আনা হয়। তাছাড়া সদর দপ্তর থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে যাওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করে, কারণ ঐসব এলাকায় প্রকল্পের কাজ বেশি হয়, ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবৈধ আয়ের সুযোগ বেড়ে যায়। এ ধরনের বদলির ক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন হয় এবং সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ এ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে বলে এলজিইডি'র কয়েকজন কর্মকর্তা জানান।

**বক্স ২: জ্যেষ্ঠতার তালিকায় অনিয়ম**

জ্যেষ্ঠতার তালিকায় পরিবর্তনের কারণে এলজিইডি'র একজন প্রকৌশলী কমপক্ষে ছয়বার পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ১৯৯০ সালে তাঁর ক্রম ছিল ৩১, ১৯৯৫ সালে ৩৪, ২০০১ সালে ১১৪ এবং ২০০৮ সালে ৫৮। ২০০১ সালে উক্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে মামলা করলে তার ক্রম ১৪-তে চলে আসে। কিন্তু ২০০৮ সালে তাকে আবার পিছিয়ে ৫৮ ক্রমে দেওয়া হয়। দেখা যায় গত ১৫ বছরে জ্যেষ্ঠতা ক্রমিকে এই কর্মকর্তর আগে থাকা ১৩ প্রকৌশলীর বেশিরভাগ অবসরে চলে গেছেন বা মারা গেছেন। ফলে জ্যেষ্ঠতা ক্রমিকে দ্বিতীয় স্থানে চলে আসেন। কিন্তু অধিদপ্তর এই ক্রম স্বীকার না প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। মামলা থাকার কারণে তাঁকে পদোন্নতি দেওয়া হয়নি বলে দাবি করা হলেও বিচারাধীন মামলা থাকা সত্ত্বেও অন্যদের পদোন্নতি দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

*সূত্র: এলজিইডি'র একজন ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীর সাক্ষাৎকার*, ২৮ আগস্ট ২০১২।

***পদোন্নতি:*** গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। মূলত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় এই তালিকা প্রণয়ন করে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং এলজিইডি'র সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর। দেখা যায় এই তালিকা ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাঁচবার পরিবর্তন করা হয়েছে, এবং এই প্রক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

তথ্যদাতাদের মতে মামলার ওপরে পদোন্নতি নির্ভর করলেও ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন কর্মকর্তার চাকরি আত্তীকরণ নিয়ে আদালতে মামলা চলাকালীন অবস্থায় তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়, আবার কোনো একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে বলে কর্তৃপক্ষ পদোন্নতি দিচ্ছে না বলে মত প্রকাশ করেন (দেখুন বক্স ২)।

এছাড়া দেশের ৫৪টি জেলায় দীর্ঘদিন এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী ছিল না। পদোন্নতির মাধ্যমে পদগুলো পূরণ করার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে সহকারী প্রকৌশলীদের 'নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত' বলে নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব কাউকে দেওয়ার কোনো নিয়ম নিয়োগ বিধিমালা অথবা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা নেই। প্রধান প্রকৌশলী অফিস আদেশের মাধ্যমে এ ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, যদিও সহকারী প্রকৌশলীদের নির্বাহী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া প্রধান প্রকৌশলীর এখতিয়ারের বাইরে।[৪০]

### *৩.২.৫ পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম*

সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা এলজিইডি'তে পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম রয়েছে বলে জানান। তাঁদের মতে কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কাদের-এর (২০১০: ১০৪) গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইডিএ'র

---

[৩৯] 'বিধি লঙ্ঘন করে নিযুক্ত ১৮৩৭ জন নিয়মিত হলেন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট ২০১২। গত ১১ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ সম্মতি ভূতাপেক্ষ সম্মতি হিসেবে দেওয়া হয়। তবে বিষয়টি ভবিষ্যতে কখনো নজির হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করে দেয় মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী প্রচলিত বিধান অনুসারে মাস্টাররোল বা কার্যভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ৬৩৭ জন এবং ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগ পাওয়া ২০৮ জনকে নিয়মিত করা যাবে না।

[৪০] উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের পদোন্নতি/পদায়ন সংক্রান্ত [এস-৫/১সি-৪/৮৫/২৮৯ (৫২৬)] স্মারকের ৯ নং ধারায় উল্লেখ আছে, "কোনো সহকারী প্রকৌশলী/ থানা প্রকৌশলীকে নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্বে) পদে নিয়োগ/বদলির প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।" সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০১১।

আর্থিক সহায়তায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন' প্রকল্পে এলজিইডি'র কয়েকজন কর্মকর্তাকে পরামর্শক হিসেবে উল্লেখ করে ছয় থেকে সাতগুণ বেশি বেতন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করা হয়, যেমন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি।

### ৩.৩ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লজিস্টিকস ব্যবহার

সরকারি এবং বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প প্রস্তাবে গাড়ি (শুধু বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে), আসবাবপত্র, বা কম্পিউটার কেনার জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে, যা পর্যায়ক্রমে ক্রয় করা হয়। বর্তমানে এক প্রকল্পের লজিস্টিকস অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করার জন্য কোনো নীতিমালা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের নেই, তবে প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুযায়ী এ ধরনের লজিস্টিকস ব্যবহার করা হয়। সাধারণত প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের নামে যেসব গাড়ি কেনা হয় তা পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়,[৪১] তবে অনেক সময় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ বলে পরিবহন পুল এসব গাড়ি ফেরত দিয়ে দেয়। তখন সেগুলো প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ প্রকল্পের গাড়ি প্রধান প্রকৌশলীর নামে কেনা হয়। প্রকল্পের অন্যান্য লজিস্টিকস, যেমন আসবাবপত্র, কম্পিউটার প্রভৃতি প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় এবং পুরানো হয়ে গেলে নিলামে বিক্রি করা হয়।

#### ৩.৩.১ *সরকারি নীতিমালা না মেনে গাড়ি ব্যবহার*

বর্তমানে এলজিইডিতে রাজস্ব খাতভুক্ত ১৫৬টি ও প্রকল্প খাতভুক্ত ২০৯টি গাড়ি চলমান রয়েছে। উপর্যুক্ত রাজস্ব খাতভুক্ত এবং প্রকল্প খাতভুক্ত গাড়িগুলোর মধ্যে প্রতিটি জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য গড়ে তিনটি করে এবং বাকি সদর দপ্তরে ব্যবহৃত হয়।

**সারণি ৩.১: এলজিইডি'র গাড়ির সংখ্যা**

| খাত | গাড়ির সংখ্যা |
|---|---|
| রাজস্ব খাত | ১৫৬ |
| প্রকল্প খাত | ২০৯ |
| বিদেশি মিশন/ পরামর্শক দলের ব্যবহার ও জেলা পর্যায়ের সফরের জন্য | সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই |
| অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহৃত | ৮১ (আনুমানিক) |

*সূত্র:* এলজিইডি সদর দপ্তর, প্রশাসন শাখা, ৮ ডিসেম্বর ২০১১।

কতগুলো গাড়ি বিদেশি মিশন বা পরামর্শক দলের ব্যবহার ও জেলা পর্যায়ের সফর করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য এলজিইডি'র কাছে নেই। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গাড়ির প্রয়োজন হলে এলজিইডি'তে চাহিদাপত্র পাঠান। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে এভাবে কতগুলো গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঠিক কোনো হিসাব এলজিইডি'তে নেই। উল্লেখ্য, এসব গাড়ির যাবতীয় ব্যয় এবং চালকের বেতন-ভাতা এলজিইডি বহন করে।

সরকারি গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা অনুযায়ী সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান (যারা যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার নিচে নন) সার্বক্ষণিকভাবে ব্যক্তিগত কাজে এবং সরকারি কাজে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। এই নীতিমালা অনুযায়ী শুধু প্রধান প্রকৌশলী ছাড়া এলজিইডি'র অন্য কোনো কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি নেই।[৪২] তবে সদর দপ্তরে প্রায় সব প্রকৌশলী এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অফিসে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন, এবং নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে শুরু করে সুপারিনটেনডেন্ট প্রকৌশলী পর্যন্ত প্রায় সকলেই সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন বলে তথ্যদাতারা জানান। ছেলেমেয়েদের স্কুল, কোচিং, শপিং থেকে শুরু করে বাসার জন্য বাজার করার কাজে এসব গাড়ি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তারা ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি নিয়ে ঢাকার বাইরে যান। গাড়িচালকরা এজন্য ওভারটাইম দাবি করে, এবং সে অনুযায়ী ওভারটাইম পেয়ে থাকে। তথ্যদাতাদের তথ্য অনুযায়ী কর্মকর্তারা গাড়ির লগবুক নিজেদের সুবিধামতো পূরণ করে, গাড়িচালকরা শুধু স্বাক্ষর করে।

#### ৩.৩.২ *গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি*

প্রকল্প শেষের পর ব্যবহৃত গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও এসব গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ পরিবহন পুলের করতে হয় বলে তারা গাড়ি জমা নিতে চায় না। পরবর্তীতে এসব গাড়ি অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়, যেহেতু সরকারি প্রকল্পে গাড়ি কেনার জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে না। কিন্তু এসব গাড়ি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এলজিইডি'র বেতনভুক্ত চালকসহ ব্যবহার করেন। এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় এ প্রকল্পের

[৪১] এলজিইডি'র তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রায় ১১৬টি গাড়ি প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর সরকারের পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়েছে, ১১টি গাড়ি পরিবহন পুলে জমা দেওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত এবং ১৪০টি গাড়ি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[৪২] তথ্যদাতাদের মতে, সরকারের যেকোনো বিভাগের প্রধানকে যুগ্মসচিবের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হয়।

অধীনে মোট ছয়টি জীপ ও ১৬টি মোটর সাইকেল প্রকল্প সমাপ্তি শেষে নিয়মানুযায়ী সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেওয়া হয়নি। এসব যানবাহন বর্তমানে এলজিইডি'র বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৪৩]

গবেষণায় দেখা যায় পরিবহন শাখার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নামে অর্থ আত্মসাৎ করে। এলজিইডি'র গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে, একজন চালক যার মেকানিক। সরকারি গাড়ি ব্যবহার নীতিমালা অনুযায়ী একটি গাড়ি মেরামতের প্রয়োজন আছে কিনা তা সর্বপ্রথম উক্ত গাড়ির চালক কর্তৃপক্ষকে একটি আবেদনের মাধ্যমে অবগত করবেন। কিন্তু দেখা যায় যেসব গাড়িতে কাজ করার প্রয়োজন নেই সেসব গাড়ির নামে বিল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়, ঐ গাড়ির চালককে কোনো কিছু জানানো হয় না। তাদের কাছ থেকে গাড়ির সমস্যা সম্পর্কে না জেনেই ওয়ার্কশপে পাঠানো হয় এবং ভুয়া বিল করা হয়। নিজস্ব গ্যারেজ ছাড়াও নাভানা, র‍্যাংগস এবং শ্যামলীর আরও কয়েকটি ওয়ার্কশপে এলজিইডি'র গাড়ির কাজ করানো হয়। এসব ওয়ার্কশপ থেকেও অতিরিক্ত বিল করে নেওয়া হয় এবং সেই বিল জমা দেওয়া হয়। এছাড়া বাংলা মটরের কয়েকটি দোকান থেকে যন্ত্রপাতি না কিনেও দোকানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আঁতাত করে ভুয়া বিল জমা দেওয়া হয়, এবং যন্ত্রপাতির দোকানগুলোকে এই বিলের কিছু অংশ দেওয়া হয়।

### ৩.৪ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট) সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং সীমাবদ্ধতা

এলজিইডি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সিএজি কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে[৪৪] যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- ***বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া:*** বাজেয়াপ্ত পারফরমেন্স সিকিউরিটি, দরপত্র বিক্রি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, ল্যাবরেটরি টেস্ট ফি;
- ***নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া:*** কাজের গুণগত মানের ল্যাবটেস্ট না করে বিল প্রদান, ঠিকাদারকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, বিভিন্ন কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট দেখিয়ে ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত বিল আদায়;
- ***নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম আদায়:*** আয়কর বাবদ কম টাকা আদায় করা, ঠিকাদারদের বিল হতে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করা; রোড রোলার ভাড়া আদায় না করা, ঠিকাদারের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত না করা;
- অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা-বহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়;
- চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ।

পূর্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় এবং রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও পূর্ববর্তী বছরগুলো অর্থাৎ ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের কার্যক্রমের ওপরও নিরীক্ষা করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর শুরু থেকেই তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তথ্যদাতাদের মতে, জনবলের স্বল্পতার কারণে পূর্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় এবং রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর যথাসময়ে সকল বিভাগের নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি।

**সারণি ৩.২: এলজিইডি'র নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য (১৯৯২-২০১২)**

| কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী নিরীক্ষা | নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা | নিষ্পন্নের সংখ্যা | অনিষ্পন্নের সংখ্যা | অনিষ্পন্ন অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা ) |
|---|---|---|---|---|
| বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অডিট আপত্তি | ৫,২৭৯ | ৪,৮৪৭ | ৪৩২ | ৩০৮.৫৬ |
| পূর্ত কাজের অডিট আপত্তি | ৫,২৯১ | ৫,০৯৬ | ১,১৯৫ | ৬৫১.৯৭ |
| জিওবি (প্রকল্প) | ৫১৫ | ৩৭০ | ১৪৫ | ৪০৮.৮৭ |
| **মোট** | **১২,০৮৫** | **১০,৩১৩** | **১,৭৭২** | **১,৩৬৯.৪০** |

***সূত্র:*** *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২, পৃ. ৭।*

এলজিইডি'র নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে নিচের দুর্নীতি ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা যায়:

১. তথ্যদাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরনের কথা প্রচলিত আছে, যথা: "অডিট করাবেন, না অডিট করব?"। অর্থাৎ নিরীক্ষা করার সময়ে নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা (ঘুষ, আপ্যায়ন প্রভৃতি) পূরণ করা হলে তাকে 'অডিট করাবেন' বলে ধরা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইচ্ছানুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ থাকে। অন্যদিকে যখন নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা পূরণ করা হয় না, তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী নিরীক্ষা করে থাকে তখন তাকে 'অডিট করব' বলে ধরা হয়।

২. এছাড়া টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে যেহেতু অডিট করানো হয় না সেহেতু তারা টেকনিক্যাল অনেক বিষয় অর্থাৎ একটি রাস্তা কত ইঞ্চি পুরু হয়েছে, কী পরিমাণ সুরকি, বালু দিতে হয়েছে, কী ধরনের ইট, বালু সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় যে নকশা ছিল সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তারা পারদর্শী নয়।

---

[৪৩] বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০০৯-১০।

[৪৪] প্রতিষ্ঠা (১৯৯২) থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত এলজিইডি, সিএজি ও পূর্ত নিরীক্ষা অধিপ্তরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে।

৩. জনবলের স্বল্পতার কারণে পূর্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় এবং রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্তৃক সকল প্রকল্পের নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এছাড়া নমুনায়নের ভিত্তিতে যেসব প্রকল্প নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয় তার প্রত্যেকটি স্কিম ধরে নিরীক্ষা করা হয় না।

**৩.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ**

একটি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক নজরে তথ্য পাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তন করা হয়েছে। এলজিইডি'র নাগরিক সনদ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপঃ

১. ওয়েবসাইটে নাগরিক সনদ দেওয়া রয়েছে, কিন্তু প্রধান কার্যালয় এবং স্থানীয় কোনো কার্যালয়ে এটি জনসমক্ষে টানানো না থাকার ফলে এটি সাধারণ জনগণ এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (ঠিকাদার, পরামর্শক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি) ব্যবহার উপযোগী নয়।
২. নাগরিক সনদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন সেবা কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, কোথা থেকে পাওয়া যাবে এবং কিভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ অবকাঠামো ও এর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে ও কার কাছে পাওয়া যাবে তা নাগরিক সনদে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে এলজিইডি কিভাবে এসব তথ্য সংগ্রহ করবে তা বলা হয়েছে। আবার দরপত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন কিভাবে ও কোথায় প্রকাশ করা হবে তা বিস্তারিত বলা হয়নি, বরং পিপিআর-এর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে আরও যেসব সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

১. ওয়েবসাইটে জনবল সংক্রান্ত সব তথ্য, যেমন কতজন উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বা প্রকল্পে কাজ করছে, শূন্যপদের তথ্য ইত্যাদি দেওয়া নেই।
২. এলজিইডি-সংশ্লিষ্ট সব ধরনের প্রতিবেদন, যেমন আইএমইডি'র প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ইত্যাদি সবগুলো দেওয়া নেই।
৩. ই-গভার্নেন্স চালু করা হয়েছে বলা হলেও বাস্তবে এটি মাত্র শুরু হয়েছে। এখনো ই-টেন্ডারিং বা ই-প্রকিউরমেন্ট চালু হয়নি। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো চালু হয়নি; শুধু কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চালু হয়েছে।

**৩.৬ উপসংহার**

এ অধ্যায়ে এলজিইডি'র কিছু আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন নিয়োগ ও পদায়নের জন্য এলজিইডি'র নিজস্ব কোনো বিধি, নীতিমালা বা কমিটি নেই, যার এসব ক্ষেত্রে অনিয়মের সুযোগ করে দিচ্ছে। এলজিইডি'তে প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে বলে দেখা যায়। জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে যেমন অনুমোদিত কোনো কোনো পদের উল্লেখযোগ্য অংশ শূন্য, উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং পরামর্শক নিয়োগে অনিয়ম। এছাড়া অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লজিস্টিকস যেমন কম্পিউটার ও গাড়ি ব্যবহার করা হয়। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা থেকে বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম টাকা কর্তন, বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম আদায়, অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা-বহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়, এবং আত্মসাৎ। এছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশেও কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে প্রকল্প প্রণয়নে কী ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম বিদ্যমান তা আলোচনা করা হবে।

*অধ্যায় চার*

# প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা ও অনিয়ম

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন, কৃষি এবং পরিবহন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা তৈরির জন্য ২০০৫-২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তবে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যা প্রতিশ্রুতি ও উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে, এবং যার ফলে শুধুমাত্র উন্নয়ন প্রকল্প নয় বরং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২০১০)। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। দেখা যায় এসব উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায় থেকেই এলজিইডি বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই অধ্যায়ে এলজিইডি'র প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন সমস্যা ও অনিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### ৪.১ এলজিইডি'র প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ সরকারের যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা করার জন্য ধারণা তৈরি, ধারণার মূল্যায়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা সংক্রান্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় (চাধা, ১৯৮৯: ৫৩)। একটি প্রকল্প অনুমোদনের আগে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করতে হয়, যথা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, গঠন, পুনরায় পর্যবেক্ষণ, সময়সীমা নির্ধারণ। প্রকল্প অনুমোদনের ধাপসমূহ অনুসরণ করার জন্য প্রথমত প্রকল্পের পর্যালোচনা, দ্বিতীয়ত সম্ভাব্যতা যাচাই, তৃতীয়ত মূল্যায়ন, এবং অতঃপর অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়া প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রথমত প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়, দ্বিতীয়ত গঠন, তৃতীয়ত পুনরায় পর্যবেক্ষণ এবং সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন প্রধান তিনটি কর্তৃপক্ষ যারা একটি প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত থাকে। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রকল্প পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে (সারণি ৪.১)।

**সারণি ৪.১: প্রকল্পের ধারণা তৈরি থেকে অনুমোদন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা**

| কার্যাবলী | দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা |
|---|---|
| প্রকল্প ধারণা ও প্রস্তাবনা তৈরি | ■ এলজিইডি (বাস্তবায়নকারী সংস্থা) |
| কারিগরি সহায়তা | ■ পরিকল্পনা উইং/ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের শাখা<br>■ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ |
| প্রকল্প মূল্যায়ন এবং অনুমোদন | ■ বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি<br>■ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের বিশেষ কমিটি<br>■ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি<br>■ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) |

প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনায় কোন খাতে কত বরাদ্দ দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার হতে কী পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে বরাদ্দ এবং খাত নির্ধারণ করা হয়। খাত ও বরাদ্দ নির্দিষ্ট হওয়ার পর এলজিআরডি মন্ত্রণালয় এলজিইডি'কে প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এলজিইডি প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরি করে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং মন্ত্রণালয় এটিকে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠায়। পরিকল্পনা কমিশন এলজিআরডি মন্ত্রণালয়, এলজিইডি, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) (যদি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প হয়) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে একটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে প্রকল্পটি মূল্যায়িত হয় এবং সংশোধনের প্রয়োজন না হলে একনেক সভায় পাঠানো হয়। তবে সংশোধনের প্রয়োজন হলে এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠানো হয়, এবং মন্ত্রণালয় এলজিইডি'তে প্রকল্প পরিকল্পনাটি সংশোধন করার জন্য পাঠায়। এলজিইডি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করে আবার মন্ত্রণালয়ে পাঠায় এবং মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনে পাঠায়। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি থেকে মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রকল্প পরিকল্পনাটি একনেকে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের বাজেট ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হলে তা অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, এবং ২৫ কোটির টাকার বেশি হলে একনেকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করে থাকেন।

একনেকের যদি কোনো পর্যবেক্ষণ না থাকে তাহলে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে আবার পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এলজিইডি'তে পাঠানো হয়। সবশেষে এলজিইডি থেকে সংশোধনের করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে একনেকে অনুমোদন করা হয় (চিত্র ৪.১)।

**চিত্র ৪.১: প্রকল্প পরিকল্পনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া**

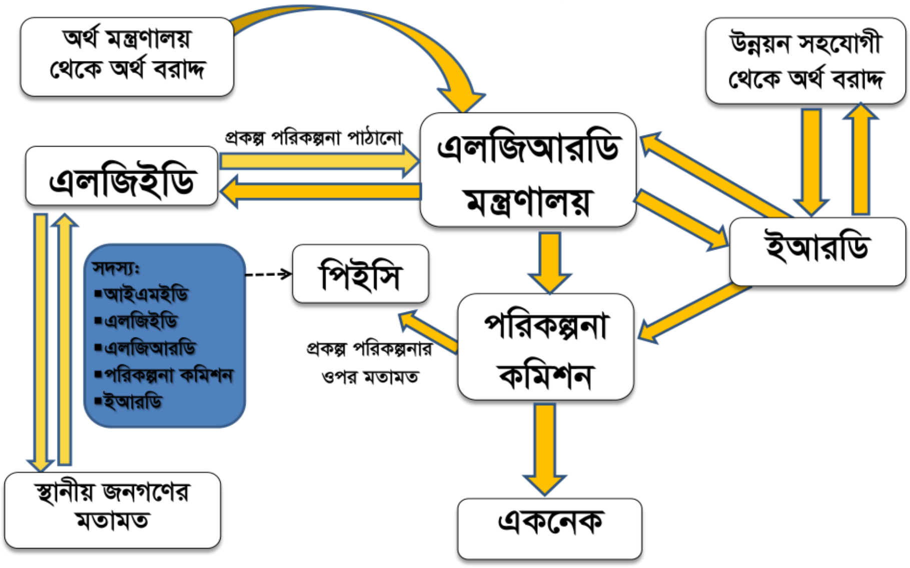


**৪.২ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা**

নিচে এলজিইডি'র প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

**৪.২.১ প্রকল্পের ধারণা হতে বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা**

একটি প্রকল্প ধারণা থেকে শুরু করে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির পর্যায় পর্যন্ত যেতে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়: ধারণার মূল্যায়ন, প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং সম্ভাব্যতা যাচাই। মূল্যায়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করতে হয়। একটি প্রকল্প ধারণা থেকে প্রস্তাব তৈরির পর্যায়ে যেতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন মাস প্রয়োজন হয়। এছাড়া একটি প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজন হয় (চিত্র ৪.২), এবং এর পর বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে অনেক প্রকল্পের চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রয়োজন হয়।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ডিপিপি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। এরপর অর্থবিভাগের পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ কমিটিতে ১৫ কার্যদিবসের জন্য পদ ও জনবল নির্ধারণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সুপারিশ অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ডিপিপি বিশ্লেষণ করা হয়। যদি প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হয় তাহলে ডিপিপি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বা বিভাগে প্রেরণ করতে হয় এবং ২৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হয়। তারপর ডিপিপি নিয়ে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন কার্যবিবরণী জারি করা হয়। এই সভায় ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন মনে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক পুনর্গঠনের জন্য ২৫ কার্যদিবস দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গবেষণায় পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ১৯৯২ সালে একনেক সভায় গৃহীত হলেও ১৯৯৭ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এলেন গোল্ডস্টাইনের ভাষায়,

> "In some instances, development partners are waiting one to two years after the signing of a financing agreement with the government for an approved development project proposal allowing activities to begin and money to flow. This is a tragedy for the people of Bangladesh. ... Perhaps the most binding constraint for many development partners is the cumbersome project approval and revision process, embodied in the Development Project and Technical Assistance Proformas (DPP/TPP)."[৪৫]

[৪৫] ইআরডি'তে ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত লোকাল কনসালটেন্সি গ্রুপের একটি সভায় তিনি এ কথা বলেন (সূত্র: *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ মার্চ ২০১২)।

**চিত্র ৪.২: উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির নির্ধারিত সময়সীমা (কার্যদিবস ধরে)**

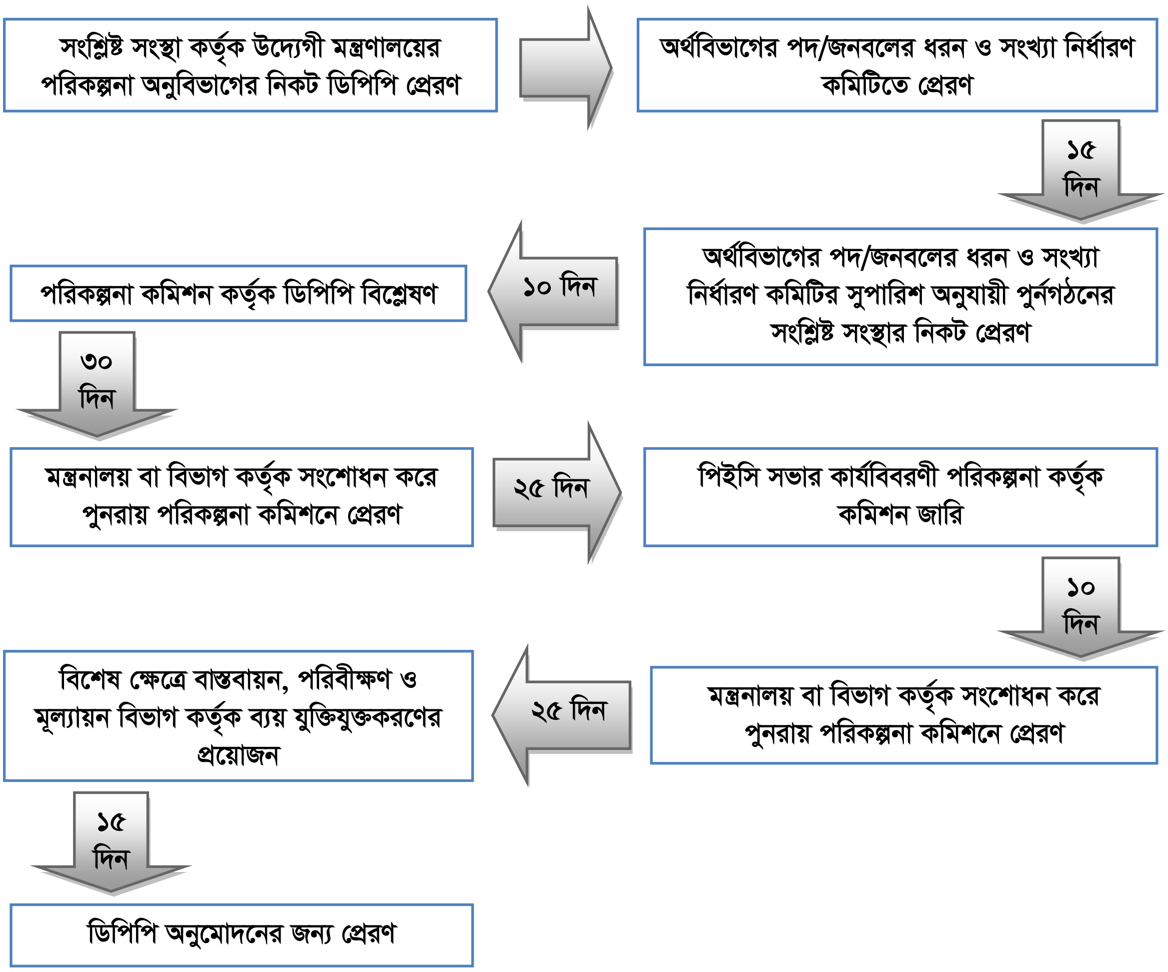


### ৪.২.২ প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব

তথ্যদাতাদের মতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে (সাহায্য বা ঋণ হিসেবে) বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঐ সংস্থার সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রথমে কোন খাতে (যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, পানিসম্পদ উন্নয়ন বা কৃষিসম্পদ উন্নয়ন) অর্থায়ন করবে তা চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করে, এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। এরপর এলজিইডি নির্দেশিত খাতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করে থাকে। এমনকি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোন খাতে প্রকৃতপক্ষে অর্থায়ন প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে না।

**বক্স ৩: দুই উপজেলায় পাঁচ বছরে প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্রিজ নির্মাণ**

ভোলার দৌলতখানের সৈয়দপুর, চরখলিফা ও ভবানীপুর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ঢোসের খালের ওপর রয়েছে সারিবদ্ধ সেতু। এক বাড়ি এক সেতু, এক ঘর এক সেতু রয়েছে অসংখ্য। কোথাও আবার বাড়িঘর ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছে সেতু। ২০ থেকে ২৫ গজ পর পর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এসব সেতুর নাম দিয়েছেন ‘কর্মী পুনর্বাসন ব্রিজ’। সরকারি হিসাব অনুযায়ী শুধু দৌলতখান উপজেলায় ‘হালকা যান প্রকল্পে’র অধীনে জোট সরকারের পাঁচ বছরে ১৯১টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বোরহাউদ্দিন উপজেলার পেটমানিকা খালের উপর রয়েছে অসংখ্য সেতু। তৎকালীন ক্ষমতাধর সংসদ সদস্যের সময়ে তার নির্বাচনী এলাকার দুই উপজেলায় পাঁচ বছরে প্রায় পাঁচ শতাধিক সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ভোলার ভেলুমিয়া কিংবা ভেদুরিয়া থেকে চর কচ্ছপিয়া পর্যন্ত প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পথে যাতায়াতের জন্য নেই কোনো ফেরি বা বড় সেতু।

*সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জানুয়ারি ২০১০।*

### ৪.২.৩ রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন

দেখা যায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা করে থাকেন। ফলে দেখা যায় বিভিন্ন সরকারের আমলে কিছু বিশেষ এলাকার উন্নয়ন বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া এলাকা নির্দিষ্ট করে প্রকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরও সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকেন, যার ফলে প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কুমিল্লা অঞ্চলের প্রকল্পটি ছয়বার সংশোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় সংশোধনের ক্ষেত্রে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দাবিতে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৬] এছাড়া খুলনা অঞ্চলের একটি প্রকল্পে জন-প্রতিনিধিদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিকল্পনা প্রথমবার সংশোধন করা হয় বলে এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।[৪৭]

এলজিইডি'র কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ঐ জেলার বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরাসরি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রধান প্রকৌশলীর কাছে সুপারিশ করেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের বা নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে আনা হয়। উদাহরণ হিসেবে সারাদেশে সংযোগ সড়কহীন সেতু নির্মাণের উল্লেখ করা যায় (দেখুন বক্স ৪)।

**বক্স ৪: সংযোগ সড়কহীন সেতু[৪৮]**

এলজিইডি'র হিসাব অনুযায়ী ২০০৮ সালে ৬২টি জেলায় সড়কের সঙ্গে সংযোগ নেই এমন সেতুর সংখ্যা ছিল ২,৭২৮টি। এর মধ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ৫৮ জেলায় নির্মিত সেতুর সংখ্যা ছিল ২,২৯৯টি, যা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাজনীতিক, ঠিকাদার এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্তৃত্বধারী ব্যক্তিরা নিজেরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে সেখানে এরকম সেতু নির্মাণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির (কাবিখা) আওতায় খাদ্যশস্যের মাধ্যমে সংযোগ সড়ক এবং খাদ্যশস্য বিক্রি করে সেতু নির্মাণ করার কথা থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় তড়িঘড়ি সেতু তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কোনো বরাদ্দ না দেওয়ায় সড়ক নির্মাণ করা হয়নি।

### ৪.২.৪ সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের প্রকল্প প্রণয়নের নিয়ম অনুযায়ী, সড়ক পরিবহন খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (DPP- Development Project Proforma) প্রকল্প মূল্যায়ন কাঠামোর (PAF- Project Appraisal Framework) তথ্য দিতে হয় এবং পিএএফ অনুসরণে প্রকল্প সারসংক্ষেপ মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সারণি (Project Appraisal Summary Report & Table) সংযুক্ত করতে হয়।[৪৯] এছাড়া ১০০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলোজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষার প্রতিবেদন থাকতে হবে।[৫০] উল্লেখ্য, সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ব্যয় প্রকল্পের অর্থ উন্নয়ন বাজেট থেকে সংস্থান করতে হবে। দুই কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রকল্প বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন, এবং দুই কোটি টাকার বেশি ব্যয়ের প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং বা সেক্টর ডিভিশনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং পিইসি'র সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হবে। কোনো প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।[৫১]

**বক্স ৫: প্রকল্প মূল্যায়ন করার সময় প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন খুঁজে না পাওয়া**

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করতে দেওয়া হয় একজন গবেষককে, যিনি জাতীয় পর্যায়ের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনি এই কাজ করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই জরিপের প্রতিবেদনটি প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের কাছে চান, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটি তাকে দিতে পারেনি। কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ তাকে প্রতিবেদনটি হারিয়ে গিয়েছে বলে জানায়। কিন্তু যখন বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন ছাড়া প্রকল্প মূল্যায়ন সম্ভব নয় বলে জানান, তখন কর্তৃপক্ষ জানায় যে সঠিকভাবে মাঠ পরিদর্শন না করে অল্প অর্থের বিনিময়ে একজন পরামর্শক দ্বারা একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যা বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। উপরন্তু সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এবং পরামর্শক ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন।

*সূত্র:* মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ৫ জানুয়ারি, ২০১১।

---

[৪৬] 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (৬ষ্ঠ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প।

[৪৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Greater Khulna District Infrastructure Development Project, Revised Development Project Proforma (Special Revision), July 2008, p. 3।

[৪৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শরীফুল ইসলাম হাসান, 'পৌনে তিন হাজার সেতু কোনো কাজে আসছে না', *দৈনিক প্রথম আলো*, বিশেষ সংখ্যা, ১৮ মে ২০০৮।

[৪৯] পরিকল্পনা বিভাগ, 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি', মে ২০০৮, পৃ ৯।

[৫০] *প্রাগুক্ত*।

[৫১] *প্রাগুক্ত*।

গবেষণায় দেখা যায়, উপর্যুক্ত কাজগুলো, যেমন প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে প্রস্তাব, পিএএফ, পিএএফ অনুসরণে প্রকল্প সারসংক্ষেপ মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সারণি, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষার প্রতিবেদন যথার্থভাবে দেওয়া হয় না। এছাড়া বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। স্বজনপ্রীতি এবং এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে দেখা যায়, বিশেষজ্ঞরা বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবেদন প্রণয়ন না করে নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে ধারণা সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে (বক্স ৫)।

এছাড়াও আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত চার বছরের (২০০৭-২০১০) প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অনুমান-ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন অর্থাৎ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন অন্যতম একটি সমস্যা হিসেবে প্রতিবার চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এলজিইডি'র একজন তথ্যদাতা জানান একটি প্রকল্পের অধীনে রাস্তার পাশে মাটি ভরাট করা দরকার ছিল, যা না হলে রাস্তা বেশি দিন টেকে না। অথচ সম্ভাব্যতা যাচাই না করার কারণে এই প্রকল্পে মাটি ভরাটের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে গ্রামীণ সড়কগুলোতে সেতু নির্মাণের সময় সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ করার প্রয়োজন আছে কিনা তা সম্ভাব্যতা যাচাই না করার ফলে দেখা যায় সেতুটি কোনো কাজে আসছে না।[৫২]

**চিত্র ৪.৩: প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যা ও অনিয়ম**

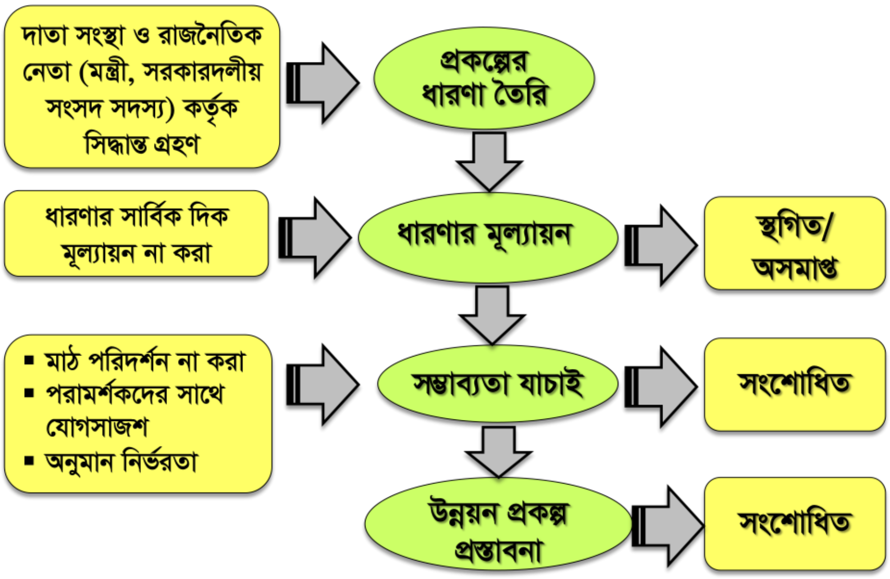


### ৪.২.৫ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রকৌশল জরিপ (Engineering Survey), সামাজিক জরিপ (Social Survey) ও কৃষি জরিপ (Agricultural Survey) করে থাকে। এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ৩-৪ বার প্রকল্প এলাকায় যেতে হয়। এসব জরিপের ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করা হয়। পরে চূড়ান্ত কাঠামো তৈরি করে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে (যেমন ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে) । প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের খসড়া প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এলজিইডি'র সুপারিশ গ্রহণের পর স্থানীয় জনগণ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্যতার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এলজিইডি'র কাছে পেশ করা হয়।

বাস্তবে এলজিইডি'র লোকবলের অভাবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে মতামত দিতে দেরি হয়। সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদনের মতামত দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ১৫ দিনের আগে তা পাওয়া যায় না। সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনের অনুমোদনের পর প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নির্বাহী প্রকৌশলীর সহযোগিতা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্কিমের কাজ বিভিন্ন জায়গায় হওয়ায় চার মাসের মধ্যে পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে জমা এলজিইডি'তে জমা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তথ্যদাতাদের মতে, একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩৬ মাসে ৩৩টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা করে থাকে। তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সহযোগিতা সময়মত না পাওয়ার কারণে কাজের মান আশানুরূপ হয় না।

[৫২] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'সংযোগ সড়ক না থাকায় কাজে আসছে না সেতুটি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩; 'দরকার সড়ক, হচ্ছে একের পর এক সেতু', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর ২০১১।

#### ৪.২.৬ প্রকল্প পরিকল্পনায় সংশোধন ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা বিবেচনা না করা

এলজিইডি'তে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট নয়টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়, যার মধ্যে ছয়টি প্রকল্পের গড় মেয়াদকাল ছিল প্রায় সাড়ে আট বছর, এবং নয়টি প্রকল্প শেষ হওয়ার গড় সময়কাল ছিল প্রায় সাত বছর। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে একটি প্রকল্পের সময়সীমা ছিল প্রায় ১২ বছর। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সাতটি প্রকল্প শেষ হয় যাদের গড় বাস্তবায়নকাল ছিল প্রায় সাড়ে সাত বছর।

**সারণি ৪.২: বিভিন্ন অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পের সংখ্যা এবং তাদের গড় মেয়াদকাল**

| অর্থবছর | সমাপ্তকৃত মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রকল্পের গড় মেয়াদকাল (বছর) |
|---|---|---|
| ২০০৬-০৭ | ৭ | ৭.২৮ |
| ২০০৭-০৮ | ৯ | ৫.২২ |
| ২০০৮-০৯ | ৯ | ৬.৭৭ |
| ২০০৯-১০ | ১১ | ৭.৯০ |

*উৎস:* ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এলজিইডি'র প্রায় সব প্রকল্প একাধিকবার সংশোধন করতে হয়, ফলে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পের সময় বেড়ে ১০/১১ বছর হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, এ গবেষণার পর্যবেক্ষণে অন্তর্ভুক্ত 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে অনুমোদিত হলেও মূল কাজ শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। এটি পাঁচ বছরমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রকল্প থাকলেও পরবর্তীতে সেটা সংশোধিত হয়ে বাস্তবায়িত হতে মোট ১১ বছর ব্যয় হয়। ফলে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরুতে যে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই তা সংস্কার করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু চলমান প্রকল্পের কোনো স্কিমের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ থাকে না। বার বার সংশোধিত হওয়ার ফলে মূল প্রকল্প থেকে কাজের পরিধিও অনেক বেড়ে যায়, এবং সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ মূল বাজেট থেকে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে উল্লিখিত প্রকল্পের বাজেট শুরুতে ছিল ১২৫.৯৫ কোটি টাকা, যা ২০০৬ সালে ষষ্ঠবার সংশোধনের পর এর বাজেট গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৪৩.০৮ কোটি টাকায়, যার পরিমাণ মূল প্রকল্পের প্রায় দ্বিগুণ।

#### ৪.২.৭ প্রকল্প প্রস্তাবনায় অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন

এলজিইডি'র কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্প বাজেটে যে ব্যয় ধরা হয় তা বাজার মূল্য থেকে বেশি। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্পে সাতটি কম্পিউটারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১২.৭৮ লাখ টাকা, যা বাজারমূল্যের চাইতে কয়েকগুণ বেশি। কোন কোন বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করা হয় না যাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। যেমন "যন্ত্রপাতি"র (যন্ত্রপাতির ধরন ও পরিমাণ উল্লেখ নেই) জন্য বরাদ্দ ছিল ১১.৩১ লাখ টাকা। আবার একই কাজের ব্যয় একেক প্রকল্পে একেক হারে ধরা হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা লজিস্টিকস থাকার পরও বাজেটে এগুলো কেনার জন্য ব্যয় ধরা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কাদের-এর গবেষণায় (২০১০) পার্বত্য অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইডিএ'র আর্থিক সহায়তায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন' প্রকল্পে চারটি ল্যান্ড ক্রুজার কেনার জন্য ১.২৫৯৬ কোটি টাকা, এবং স্পিড বোট, পিক-আপ, মোটর সাইকেল, ওয়াটার ট্যাংক, ট্রাক্টরসহ মোট ২৮টি গাড়ি কেনা ও পরিচালনা ব্যয় হিসেবে ১২.২৮৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু এলজিইডি'র জেলা ও থানা পর্যায়ে এসব যন্ত্রপাতি ছিল বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

### ৪.৩ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এলজিইডি'র প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। এসব অনিয়মের মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের ধারণা হতে বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা এবং একাধিকবার সংশোধন, এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন। এসব সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভাবিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

*অধ্যায় পাঁচ*

# প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে। এসব প্রকল্প এলজিইডি'র নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ এলজিইডি সম্পন্ন করে, এবং বাস্তবায়নের অবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে এলজিইডি, সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। দরপত্র আহবান, কার্যাদেশ প্রদান এবং কার্যাদেশ বাস্তবায়ন থেকে অর্থছাড় ও বিল উত্তোলন পর্যন্ত যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়, এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে কী ধরনের অনিয়ম হয় ও কী ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## ৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নঃ কার্যাদেশ প্রদান ও বিল উত্তোলন প্রক্রিয়া

একটি অর্থবছরে একটি প্রকল্পে কী পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে তা ঐ অর্থবছরের বাজেটের ওপর নির্ভরশীল। প্রকল্পের বাজেট বছর অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা থাকে। বাজেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ বণ্টন করেন, এবং এই বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রথমত দরপত্র আহ্বানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। পরবর্তীতে দরপত্রের শিডিউল বিক্রি, শিডিউল জমা, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন এবং মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া কার্যাদেশ প্রদানের পর ঐ কার্যাদেশে উল্লিখিত অর্থের ১০% কার্য-সম্পাদন জামানত হিসেবে জমা রাখতে হয়।[৫৩]

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার এলজিইডি কার্যালয়ে বিল দাখিল করে। বিল এলজিইডি কার্যালয় থেকে অনুমোদনের পর হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়ে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, একটি প্রকল্পে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিবরণী এলজিইডি এবং সিজিএ উভয় কার্যালয়েই থাকে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিজিএ কার্যালয় থেকে চেক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা হয়। অন্যদিকে বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার এলজিইডি কার্যালয়ে বিল দাখিল করে। এলজিইডি এবং বৈদেশিক সংস্থার পরামর্শক দ্বারা অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের টিম লিডার চেক দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক অর্থায়নের প্রকল্পের অর্থ যেকোনো তফসিলভুক্ত ব্যাংকে রাখা হয়।

## ৫.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

নিচে স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর আলোচনা করা হল।

### ৫.২.১ কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব

স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া সাধারণত রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেখা যায়, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা জোটের রাজনীতিকরা এই কার্যাদেশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষমতাসীন দল ও দলের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আর এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সাধারণত দরপত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

একটি জেলায় কোথায় কোন উন্নয়ন কাজ হবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐ জেলা শহরে যে সংসদীয় আসন সে আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য নিয়ন্ত্রণ করেন (আকরাম, ২০১২)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের নিকটজন ও আস্থাভাজনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, যারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট না-ও হতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে। এক্ষেত্রে কোনো কাজের বরাদ্দের ১০%-২০% পর্যন্ত কাজ পাওয়ার জন্য আদায় করা হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে অন্য দলের সংসদ সদস্যের সাথেও সমঝোতার মাধ্যমে এলাকার কাজ বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত ৬০:৪০ হিসাবে সরকারদলীয় ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে কাজ বণ্টন হয়। একটি জেলায় ৫০০ জন ঠিকাদার থাকলেও বাস্তবতঃ পাঁচ থেকে দশজন ঠিকাদারই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এরা

[৫৩] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা*, ২০০৮, বিধি ২৭, এবং তফসিল-২।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। কখনো কখনো ক্ষমতাসীন দলের কর্মী বা সমর্থিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ দরপত্র কিনতে ও জমা দিতে পারে না, এবং এজন্য প্রয়োজনে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া হয়।[৫৪]

কোনো জেলায় কাজ অনুমোদন হওয়ার পর সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যক্তি যিনি এলজিইডি'র যাবতীয় ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তিনি সংসদ সদস্যের নির্দেশে কাজ বন্টন করেন।[৫৫] কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে কাজ না দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে যৌথভাবে কাজ দেওয়া হয়। তবে দেখা যায় দলীয় মতাদর্শী নেতা-কর্মী সবাইকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কাজ পেয়ে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক কারণে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এমন অনেক ঠিকাদারও কাজ পেয়ে থাকে।[৫৬]

তথ্যদাতাদের মতে, কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে প্রকৌশলীদের সমঝোতা হয়ে থাকে এবং প্রকৌশলীরা কমিশন পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতার মাধ্যমে দরপত্র জমা দেওয়ার আগেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বাজেটের ১০%-১৫% সমঝোতাকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রকল্পে সরকারি দলের একাধিক ঠিকাদার প্রভাব খাটিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র ফরম নিয়ে যায় এবং ১৭ থেকে ১৯ ভাগ উর্ধ্বদরে দরপত্র দাখিল করে। এতে কাজের প্রাক্কলন ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮ কোটি ৬০ লাখ টাকায় - এর ১১ ভাগ অর্থ বাবদ তিন কোটি ৬৩ লাখ টাকা অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ঠিকাদার, এলজিইডি কর্মকর্তা ও জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তবে অন্যান্য ঠিকাদাররা কোন টাকা পাননি বলে জানান।[৫৭] অপর একটি উপজেলায় একটি প্রকল্পের জন্য সমঝোতার ভিত্তিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা দরপত্র জমা দেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, যেখানে স্থানীয় কোনো ঠিকাদার এই দরপত্রে অংশ নিতে পারেনি। অভিযোগ রয়েছে যে, এই সমঝোতায় সরকারদলীয় ১০-১২ জন ঠিকাদার প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে এলজিইডি অফিসে মিটিং করেন।[৫৮]

এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের মতে, রাজনীতিকদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৌশলীদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৌশলীরা যখন কোনো কাজ পরিদর্শন বা তদারকি করতে যায় তখন ঠিকাদারদের (যিনি একইসাথে ঠিকাদার ও রাজনীতিক) কাছ থেকে কখনো কখনো নানা ধরনের হুমকির (এমনকি শারীরিকভাবেও) সম্মুখীন হতে হয়।[৫৯] তখন প্রকৌশলীরা ঠিকাদারদের কাজের মান সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করে না। এলজিইডি'র একজন প্রকৌশলীর তথ্য অনুযায়ী কোনো প্রকৌশলীকে যদি সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য অথবা স্থানীয় ক্ষমতাধর রাজনীতিকরা তাদের ইচ্ছেমতো কাজে লাগাতে না পারে তখন তাকে বদলির ব্যবস্থা করা হয়।

### ৫.২.২ অনুমোদন-বহির্ভূত স্কিম বাস্তবায়ন

সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যরা সাধারণত বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কিন্তু তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসেন।[৬০] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল এডিপি'তে প্রকল্প ছিল ১,০৩৯টি, এর মধ্যে ৮০০টি প্রকল্প বরাদ্দহীন ও অননুমোদিতভাবে এডিপি'তে রাখা হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত মোট প্রকল্প

---

[৫৪] বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে এ ধরনের ঘটনার সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'ফরিদপুরে টেন্ডার নিয়ে সরকারি দলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে ৭ জন আহত', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৮ অক্টোবর ২০০৯; 'মেহেরপুরে দরপত্র দাখিল নিয়ে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ: আহত ৪', *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ ডিসেম্বর ২০০৯; 'নাটোরে বাক্স ভেঙে ২ লাখ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ টেন্ডার ছিনতাই', *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ আগস্ট ২০০৯; 'কোটালিপাড়া বিসিএল মেন স্ক্র্যাচ টেন্ডার বক্স', *দি ডেইলি স্টার*, ১৩ নভেম্বর ২০০৯; 'রাজাপুরে বাক্স ভাঙচুর করে দরপত্র ছিনতাই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি ২০১২; 'যুব লীগ ফ্যাকশনস ফাইট ফর কন্ট্র্যাক্ট', *দি ডেইলি স্টার*, ৪ মে ২০১২; 'এএল ফ্যাকশনস ক্ল্যাশ ওভার এলজিইডি ওয়ার্ক', *দি ডেইলি স্টার*, ৩১ মে ২০১০; 'নাটোরে দরপত্র জমার সময় যুবলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আটক ১০', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জুন ২০১০; 'বিসিএল ফ্যাকশনস ক্ল্যাশ ওভার এলজিইডি টেন্ডার ইন বরিশাল', *দি ডেইলি স্টার*, ৫ ডিসেম্বর ২০১২।

[৫৫] 'নিয়ন্ত্রণহীন টেন্ডারসন্ত্রাস', *দৈনিক আমার দেশ*, ২৭ জুলাই ২০১১। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এলজিইডি'র বড় বড় কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন দুইজন প্রতিমন্ত্রী এবং কয়েকজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য। ঢাকার বাইরের কাজ স্থানীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সরকারি দলের নেতারা নিয়ন্ত্রণ করেন।

[৫৬] 'ভাগ্যবান সবাই ক্ষমতাসীন দলের', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ ডিসেম্বর ২০১১; 'এলজিইডির দেড় কোটি টাকার কাজ লটারি ছাড়াই বন্টন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১২; 'সাতক্ষীরায় কোটি টাকার টেন্ডার ভাগ করে নিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৬ নভেম্বর ২০০৯; 'ফুলপুরে সাড়ে ৪ কোটি টাকার টেন্ডার ভাগাভাগি করে নিল প্রভাবশালীরা', *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ ডিসেম্বর ২০০৯; 'গোপন টেন্ডারের মাধ্যমে ২শ' কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নেয়ার অভিযোগ', *দৈনিক যুগান্তর*, ২১ ডিসেম্বর ২০০৯।

[৫৭] 'বরগুনায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: কাজ শুরুর আগেই সাড়ে তিন কোটি টাকা লোপাট!', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

[৫৮] 'বানিয়াচংয়ে দুই কোটি টাকার কাজ ভাগবাটোয়ারা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ মে ২০১২।

[৫৯] উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় রাস্তার কাজের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করায় দিনাজপুরের এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলীকে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার লাঞ্ছিত করে (সূত্র: 'প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের পাল্টাপাল্টি মামলা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ এপ্রিল ২০১২)। একই ধরনের আরও ঘটনার জন্য দেখুন 'নিম্নমানের কাজে বাধা দেয়ায় নাটোরে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯; 'ঠিকাদারের হাতে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত: উন্নয়ন কাজ বন্ধ', *দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ*, ৪ মে ২০১১।

[৬০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জুন ২০১২।

ছিল ১,২২৮টি। যার মধ্যে বরাদ্দহীনভাবে ৫৩১টি অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬১] ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৫টি নতুন প্রকল্পসহ মোট ১,০৩৭টি চূড়ান্ত, তবে বরাদ্দহীন অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে আরও এক হাজার ৪৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের চাপে যোগাযোগ খাতেই প্রকল্প রয়েছে ১৭০টি। গবেষণায় পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কুমিল্লা জেলায় ২৬টি গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে চারটি গ্রোথ সেন্টার অনুমোদিত ডিপিপি'তেই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে 'অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-এর অধীনে এক হাজার ১৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য চলতি অর্থবছরে ৭০টি চলমান প্রকল্পের জন্য চার হাজার ৮৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[৬২]

### ৫.২.৩ দরপত্র নিয়ন্ত্রণ

বেশ কিছু উপায়ে স্থানীয় পর্যায়ে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হল। এছাড়াও কেস স্টাডি ৬-এর ঘটনা থেকে দরপত্র নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

- **বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বেই ঠিকাদার অবহিত হওয়া:** কোন ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকার ফলে দেখা যায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ঠিকাদার জেনে যায়। এছাড়া বিজ্ঞাপন এলজিইডি'র নোটিশ বোর্ডে টানানোর নিয়ম থাকলেও তা টানানো হয় না। ফলে নির্ধারিত ঠিকাদার কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য দরপত্রের শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে আগে থেকেই তার পরিকল্পনা থাকে।

**বক্স ৬: দরপত্র নিয়ন্ত্রণ**

বুধবার (১৯ মে ২০১০) ছিল পটুয়াখালী এলজিইডি'র ৩৩ গ্রুপের উন্নয়নমূলক কাজের শিডিউল বিক্রির শেষদিন। ঠিক কত টাকার এই কাজ তা বলতে পারেননি সংশিষ্ট ঠিকাদাররা। তবে সব মিলিয়ে কম করে হলেও ৮/১০ কোটি টাকার কাজ হবে বলে জানিয়েছেন তারা। ঠিকাদারদের অভিযোগ, কাজের টেন্ডার কিংবা শিডিউল কেনা-বেচা সম্পর্কে আগেভাগে কোনো কিছুই জানতেন না তারা। বেলা দুইটার পর ছড়ায় শিডিউল বিক্রির খবর। তাৎক্ষণিকভাবে এলজিইডির প্রধান দফতর, পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং ডিসি অফিসে ভিড় জমান সাধারণ ঠিকাদাররা। কিন্তু এসব স্থানের প্রায় কোথাও ছিল না পর্যাপ্ত শিডিউল। দরপত্র বিক্রির দায়িত্বে থাকা এলজিইডির ইউডি ক্লার্ককে খুঁজে পাননি কেউ। পুলিশ সুপারের দফতর থেকে বিক্রি হয় মাত্র ৪/৫টি শিডিউল। সংকটের কারণে ফটোকপি করে শিডিউল বিক্রির নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন।

বেশ কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, শুরু থেকেই পুরো কাজটি বাগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করে ক্ষমতাসীন দলের কতিপয় প্রভাবশালী ঠিকাদার। তাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন নির্বাহী প্রকৌশলী। যে কারণে অখ্যাত একটি পত্রিকায় ছাপা হয় ৩৩ গ্রুপের টেন্ডার। নিয়ম থাকলেও নোটিশ বোর্ডে টানানো হয়নি বিজ্ঞপ্তি। পিপিআর অনুযায়ী জেলার সবকটি উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দফতরে বিক্রি হওয়ার কথা শিডিউল। কিন্তু কোনো উপজেলায়ই ফরম পাঠায়নি নির্বাহী প্রকৌশলীর দফতর। ফরম কিনতে গিয়ে ফেরত আসা একাধিক ঠিকাদার বলেন, 'শেষ মুহূর্তে পুলিশ অফিস এবং জেলা প্রশাসন থেকে ফরম সংগ্রহ করেন কয়েকজন ঠিকাদার।'

কিন্তু তারাও তা শেষ পর্যন্ত জমা দিতে পারেননি। রাতেই টেলিফোনে হুমকি দিয়ে এবং অর্থের বিনিময়ে সেগুলো নিয়ে নেয় নেপথ্যের চক্র। মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ার পর ডিসি বাংলোর সামনে ঝাউ বাগানে হয় নেগোসিয়েশনের মিটিং। অফিস, গুছ পার্টি এবং নেতাদের মিলিয়ে মোট ১৫ পার্সেন্ট দেয়ার চুক্তিতে নিজেদের মধ্যে বণ্টন হয় ১৫ গ্রুপের কাজ। ঝামেলা সামলাতে নির্বাচিত এক প্রতিনিধিকে দেয়া হয় মোটা অংকের ঠিকাদারি। এমনকি কতগুলো শিডিউল বিক্রি হয়েছে এবং কতগুলো জমা পড়েছে তা পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে যতদূর জানা গেছে, ৩৩ গ্রুপের এই কাজের বিপরীতে মাত্র ৬৯টি শিডিউল বিক্রি করেছে পটুয়াখালী এলজিইডি। অথচ প্রকাশ্য টেন্ডার হলে এই বিক্রির পরিমাণ দাঁড়াত সাড়ে তিনশ'র বেশি। সেই সঙ্গে মোটা অংকের রাজস্ব আয় করতে পারত সরকার।'

***সূত্র:*** *দৈনিক যুগান্তর*, ২১ মে ২০১০ থেকে সংগৃহীত।

- **পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ:** 'সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮' (পিপিআর ২০০৮) অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে দরপত্রের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয়। বাস্তবে বহুল প্রচারিত নয় এমন পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না বলে তথ্যদাতারা জানান। ফলে স্থানীয় অনেক ঠিকাদার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে জানতে পারে না। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও তা এলাকায় পৌঁছানোর পূর্বেই সব কপি নির্ধারিত ঠিকাদার কিনে নেয়। অনেক সময় দেখা যায় পত্রিকায় দুটো সংস্করণ থাকে, এবং প্রথম সংস্করণে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয় না। একটি ঘটনায় দেখা যায় দরপত্র আহবানের নিয়ম অনুযায়ী বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে

[৬১] জাফর আহমেদ চৌধুরী, 'এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতি ও জাতীয় ক্ষতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ এপ্রিল ২০১২।

[৬২] স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ২০১২ এর ৫ সেপ্টেম্বর সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান (সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

দৈনিক ডেসটিনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে দরপত্র নেই বলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানায়।[৬৩] আরেকটি ক্ষেত্রে একটি জেলায় বিক্রি হয় না এমন দুইটি সংবাপত্রে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।[৬৪]

- **দরপত্র প্রাপ্তির সীমিত সময়:** সংবাদপত্রে দরপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথেই দরপত্রের শিডিউল পাওয়া যায় না, যেহেতু কোন ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হবে সে বিষয়ে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া থাকে। তাই দরপত্রের শিডিউল দেরিতে ছাড়া হয় যেন কম শিডিউল বিক্রি হয় ও জমা পড়ে। দেখা যায় দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের তিন দিন আগে দরপত্র ছাড়া হয়, ফলে অনেক ঠিকাদার শিডিউল কিনতে পারে না, বা অনেকে কিনতে পারলেও যথাসময়ে জমা দিতে পারে না।

- **রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র শিডিউল জমা:** শিডিউল যে পরিমাণ বিক্রি হয় তার সবগুলো জমা পড়ে না, কারণ রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে তিন থেকে পাঁচটি শিডিউল জমা দেওয়া হয়।[৬৫] পিপিআর-এর নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে তিনটি শিডিউল জমা পড়লে দরপত্রের বাক্স খোলা যাবে। রাজনৈতিক সমঝোতা কয়েকভাবে হয়ে থাকে:
  ১. যারা শিডিউল কেনে তারা যেন শিডিউল জমা না দেয় সেজন্য তাদের সবাইকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়। এর ফলে দরপত্র নিয়ে মারামারি হয় না।
  ২. সবগুলো শিডিউল একই রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কেনে, এবং পরবর্তীতে কারা জমা দেবে তা নিজেদের মধ্যে নির্ধারণ করে নেওয়া হয়।
  ৩. রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত ঠিকাদাররা সবাই একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসে। তারপর যারা কাজটা পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়জন সদস্য থাকে। কমিটি আলোচনার মাধ্যমে কাজের জন্য যে সর্বোচ্চ মূল্য দেবে তাকে কাজটা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে সেই কাজের মোট বাজেটের ১০%-১৫% সমঝোতাকারীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়। ফলে অন্যান্য ঠিকাদাররা কোন বিনিয়োগ ছাড়াই নগদ টাকা পেয়ে যায়।

- **দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে না দেওয়া:** রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে শিডিউল জমা দেওয়ার সময় ঠিকাদাররা রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদের দ্বারা বাধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতার অনুমতি ছাড়া দরপত্র জমা দেওয়া সম্ভব হয় না।[৬৬]

- **দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত না হওয়া:** গবেষণায় দেখা যায় মূল্যায়ন কমিটি থাকলেও দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় না। দলীয় লোকদের কাজ দেওয়া হয় বলে সর্বনিম্ন দরদাতার কোনো গুরুত্ব থাকে না।

- **স্থানীয় প্রশাসন থেকে অসহযোগিতা:** দরপত্র ক্রয় এবং জমা দেওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হলে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না, বরং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে। যখন দরপত্রের বাক্স ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটে থাকে তখন স্থানীয় প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয় না।

### ৫.২.৪ অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার

স্থানীয় পর্যায়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এলজিইডি'র জ্ঞাতসারে অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে দরপত্র কেনা থেকে শুরু করে কার্যাদেশ নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। যাদের লাইসেন্সে বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বড় অংকের কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে, কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দেখা যায় ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা-কর্মী রয়েছে যাদের কাজ পাওয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, অন্যদিকে অনেকের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লাইসেন্স রয়েছে কিন্তু কাজ পাওয়ার মতো রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা নেই। এ কারণে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে

---

[৬৩] 'সাংসদের উদ্যোগে দরপত্র প্রক্রিয়া স্থগিত: জুড়ীতে এলজিইডির প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের ক্ষোভ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ মে ২০১২।

[৬৪] 'ভোলায় দরপত্র জমাদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০১২।

[৬৫] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি উপজেলার চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজের জন্য দরপত্র আহবান করার পর সমঝোতার মাধ্যমে ৩৯ জনের মাধ্যমে তিনজন শিডিউল জমা দেয় (সূত্র: 'কাজ পাওয়ার আগেই টাকা ভাগাভাগি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ নভেম্বর ২০১২)।

[৬৬] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'জয়পুরহাটে এলজিইডির পাঁচ কোটি টাকার কাজ: শিডিউল কিনতে আওয়ামী লীগের বাধা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ ডিসেম্বর ২০১১; 'জুড়ীতে কোটি টাকার টেন্ডার জমা দিয়ে বিপাকে ঠিকাদার', *দৈনিক যুগান্তর*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯; 'তিন কোটি টাকার কাজের দরপত্র জমা দিতে বাধা!', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ অক্টোবর ২০১০; 'ভোলায় দরপত্র জমাদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০১২।

থাকে।[৬৭] এক্ষেত্রে যার লাইসেন্স ব্যবহৃত হয় তার অবৈধ আয় বৈধ হয়ে যায় এবং প্রতিটি কাজের বিপরীতে তাদেরকে কর দিতে হয়। ফলে দেখা যায় কালো টাকা সাদা করার অন্যতম উপায় হচ্ছে নিজের লাইসেন্স ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া। এছাড়া এমনকি অনেক সময় স্থানীয় আসনের সংসদ সদস্যের লাইসেন্স ব্যবহার করেও কাজ করা হয়, যদিও ঐ সংসদ সদস্যের পক্ষে কাজের তদারকি করা কখনোই সম্ভব নয়। একজন ঠিকাদারের বক্তব্য অনুযায়ী, "আমার লাইসেন্স ... যে তিনটি কাজ পেয়েছে, এসব কাজ আমি করছি না। আমার কাছ থেকে .... আসনের সাংসদ ..... লাইসেন্সটি ধার নিয়েছেন। এখন তিনি কাজগুলো নিজে করবেন, না অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন, তা আমি জানি না। তবে আমি সাংসদকে বলেছি, কাজ যে-ই করুক না কেন, কাজের মান যেন ভাল হয়। নইলে আমার লাইসেন্স সম্মান হারাবে।"[৬৮]

**চিত্র ৫.১: দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির ধরন**

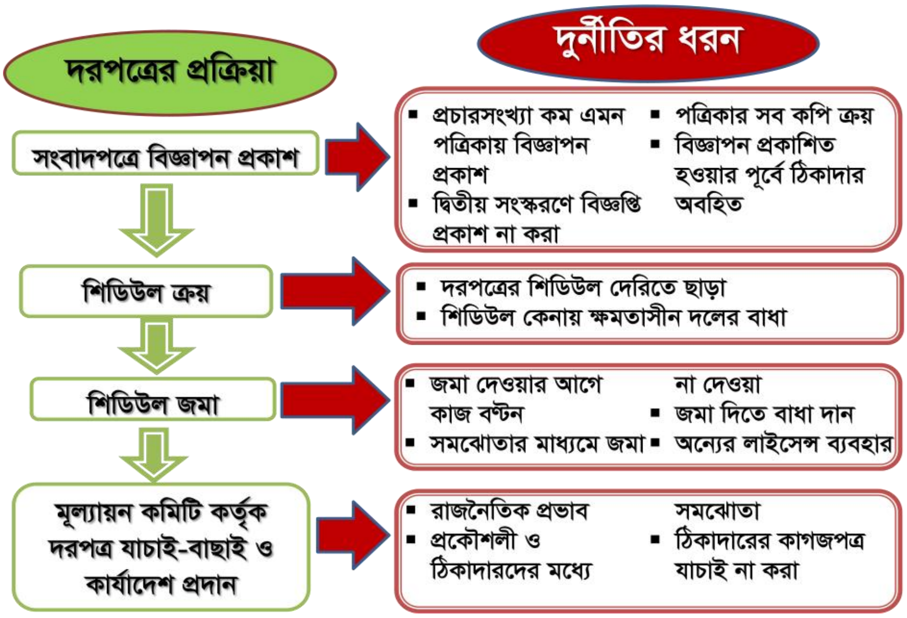


### ৫.২.৫ কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিক্রি করা

স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী এলজিইডি থেকে কার্যাদেশ পাওয়ার পর তা বিক্রি করা একটি নিয়মিত ঘটনা। এক্ষেত্রে যাকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় সে কাজ সম্পাদন না করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশনের বিনিময়ে অবৈধভাবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। তবে যার নামে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় কাজের সব দায়িত্ব তার এবং কাজ শেষ হওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত সেই কাজের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে জামানতের টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এক বছর পর তুলতে পারে। ঠিকাদারকে চলমান কাজের বাজেটের ২০% জমা রাখতে হয়। তবে এই নিয়ম যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে নিজে কাজ বাস্তবায়ন না করার ফলে কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকে না।

### ৫.২.৬ প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দুর্নীতি

এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয়ের প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের মধ্যে সমঝোতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে বেশ কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়। নিচে এসব অনিয়মের বিবরণ দেওয়া হল।

- **কার্যাদেশ পাওয়ার পর দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন:** কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদার দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন করে। তথ্যদাতাদের মতে, ঠিকাদার প্রথমে ৫% 'লেস'-এ দরপত্র দাখিল করে এবং কাজ পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সকল কাগজপত্র পরিবর্তন করে ৫% অতিরিক্ত ধরে দাখিল করে থাকে। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রকৌশলী এবং ঠিকাদার ভাগ করে নেয়।
- **ব্যাংকের কার্য-সম্পাদন জামানত (Performance Security) সংক্রান্ত অনিয়ম:** কার্যাদেশ (Notification of Award) পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে ব্যাংকে কার্য-সম্পাদন জামানত জমা দেওয়া এবং কাজ শেষ হওয়ার ২৮ দিনের পর এই অর্থ ফেরত দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ শুরু করার দুই-তিনদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে এর কিছু অংশ দিতে হয় যেহেতু ঠিকাদার এই টাকা তুলে অন্য কোথাও বিনিয়োগ অথবা ব্যাংকে জমা রেখে সুদ নিতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত (তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ৫২টি) যেকোনো ব্যাংক থেকে কার্য-সম্পাদন জামানতের সার্টিফিকেট এলজিইডি'তে জমা দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তফসিলভুক্ত ব্যাংক ছাড়াও অন্য ব্যাংক থেকে এই সার্টিফিকেট

[৬৭] উদাহরণ হিসেবে দেখুন, 'দুই বছরেও শেষ হয়নি সেতুর নির্মাণকাজ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
[৬৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ এপ্রিল ২০১২।

নেওয়া হয়, এবং এলজিইডি থেকে এটি যাচাই করা হয় না। বরং এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে যে ঠিকাদার এই সার্টিফিকেট জমা দেয় ক্ষেত্রবিশেষে তাকেই এই সার্টিফিকেট যাচাই করতে ব্যাংকে পাঠানো হয়।

- **প্রকল্পের স্কিমের মূল্য প্রাক্কলনে অনিয়ম:** এলজিইডি থেকে কোনো প্রকল্পের প্রাক্কলন করার সময় কোনো কোনো উপাদানে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ প্রাক্কলন করা হয়, আবার কোনো কোনো উপাদানের অস্তিত্ব প্রাক্কলনের সময় থাকে কিন্তু বাস্তবে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি মরা খালের ওপর সেতু নির্মাণ করার জন্য রিং বাঁধের প্রয়োজন না থাকলেও প্রাক্কলিত ব্যয়ে রিং বাঁধের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে দেখা যায় বলে এলজিইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যদাতারা জানান। আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় ঝিনাইদহে পাথর ও পিচের মিশ্রণে বড় বড় গর্ত সংস্কারের কাজে প্রতি ঘনমিটার ১,৮৭৭.১১ টাকার একটি কাজ আরেকটি স্কিমে করানো হয়েছে ৪,৮৭৭ টাকায়। এভাবে ২২ ধরনের কাজের মধ্যে ছয় ধরনের কাজে প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে অতিরিক্ত প্রায় এক কোটি টাকা বিল হয়। অন্য ঠিকাদারদের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পেয়ে অতিরিক্ত দরে কাজ দিয়েছেন।[৬৯]
- **প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করা:** তথ্যদাতাদের মতে, ঠিকাদাররা প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে না। উদাহরণস্বরূপ, এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্প ২০-এর আওতায় দশটি ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ ও ৭৭টি গ্রোথ সেন্টার বাস্তবায়িত এবং উন্নয়ন করা হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ থাকলেও পর্যবেক্ষণে ছয়টির মধ্যে দুইটি ইউপি কমপ্লেক্স ও ৪৫টির মধ্যে আটটি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়নি বলে দেখা যায়, যার ফলে যথাক্রমে ৬০ লাখ টাকা ও ১.৬ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে (সারণি ৫.১ দ্রষ্টব্য)।[৭০] আরেকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি প্রকল্পে ২৩টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও ১০টির কাজ শেষ করে সবগুলো সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে।[৭১]

**বক্স ৭: সঠিক উপকরণ ব্যবহারে এলজিইডি'র তদারকির অভাব**

কুতুবদিয়া উপজেলায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার একটি রাস্তার কাজ কয়েকজন ঠিকাদারদের মাঝে বণ্টন করা হয়। তখন এই এলাকার একজন সাধারণ ব্যক্তি ঠিকাদার এবং এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয় থেকে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা ও নকশা দেখতে চান, কিন্তু ঠিকাদার এবং এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয় রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা ও নকশা দিতে রাজি হয়নি। তখন তিনি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা ও নকশা হাতে পান। দেখা যায়, রাস্তার জন্য ২০ ইঞ্চি বক্স কাটিং করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা করা হয়নি। বালি ৮ ইঞ্চি, কাঁকর-বালি ৬ ইঞ্চি ও পাথর ৬ ইঞ্চি দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও কোথাও তা সঠিক পরিমাণে দেওয়া হয়নি। বড় রোলার মেশিন দিয়ে কম্পেকশন না করে ছোট মেশিন ব্যবহার করা হয়েছে এবং পিচ ঢালাইয়ের সময় অনিয়ম করেছে। কিন্তু এলজিইডি কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীতে এই ব্যক্তি যখন এলাকার অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে কাজে বাধা দেন তখন এলজিইডি আগের দরপত্র বাতিল করে আবার দরপত্র ডাকে, এবং প্রায় তিন মাস পর যথানিয়মে কাজ সম্পন্ন হয়।

**সূত্র:** *রোদ্দুর কথা*, বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার, ২০১১।

**সারণি ৫.১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সাপেক্ষে বাস্তবতা**

| | **ইউনিয়ন কমপ্লেক্স** | **গ্রোথ সেন্টার** |
|---|---|---|
| প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী স্কিমের সংখ্যা | ৬টি | ৪৫টি |
| বাস্তবায়িত স্কিমের প্রকৃত সংখ্যা | ৪টি | ৩৭টি |
| আইএমইডি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য | সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত | সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদিত |
| **আর্থিক অনিয়ম** | **৬০ লক্ষ টাকা** | **১.৬ কোটি টাকা** |

***তথ্যসূত্র:*** সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রস্তাবনা, আইএমইডি'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৌশলী ও ঠিকাদার নিজেদের মধ্যে সমাঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত কাজের কিছু অংশ বাদ দিয়ে থাকে। যেমন, একটি বেইলি সেতু তৈরির সময় লোড টেস্ট করার জন্য বরাদ্দ থাকলেও সাব-অ্যাসিসটেন্ট প্রকৌশলী ঠিকাদারকে এটি না করার জন্য সুপারিশ করে, এবং এ কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে তা দুজনে ভাগ করে নেয়। রাস্তা, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বালু, সিমেন্ট, রড প্রভৃতি অথবা গভীরতা এবং প্রশস্ততার বিষয়ে যেভাবে পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে ঠিকাদার সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে না। তথ্যদাতাদের মতে, দরপত্রের শিডিউলে কী ধরনের উপকরণ দেওয়া হবে তা বিস্তারিত থাকলেও কোন ধরনের উপকরণ কাজের সময় ব্যবহার করা হচ্ছে তা এলজিইডি থেকে

[৬৯] 'প্রতি বর্গমিটার ৪০৫.৮৫ টাকা দরের কাজ জালিয়াতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ৪,০০৫.৮৫ টাকা: ঝিনাইদহে সড়কের কাজে কোটি টাকা আত্মসাৎ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১২।

[৭০] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ৭।

[৭১] একনেকের সভায় এলজিইডি'র এই দুর্নীতি উন্মোচিত হয়। আইএমইডি'র তদন্তে দেখা যায় এই প্রকল্পের অধীনে ১২টি কমপ্লেক্সের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। এই তদন্তে আরও দেখা যায় এই ১১টি ভবন নির্মাণে ৬.৩৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যেখানে প্রকৃত ব্যয় প্রাক্কলিত ছিল ৩.৭৯ কোটি টাকা। তদন্তে দেখা যায় প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর ভুল তথ্য দিয়েছেন (সূত্র: 'সেইড টু বি বিল্ট, ফাউন্ড টু বি নট', *দি ডেইলি স্টার*, ১২ অক্টোবর ২০১১)। একইভাবে এলজিইডি'র আরেকটি প্রকল্পে ২৫টির মধ্যে ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন তৈরি হয়েছে, কিন্তু ৩.৬২ কোটি টাকা ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়েছে (সূত্র: 'গ্লেয়ারিং গ্রাফট', *দি ডেইলি স্টার*, ১৬ জুন ২০১০)।

তদারকি করা হয় না (দেখুন বক্স ৭)। কখনো কখনো এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের যোগসাজশে ঠিকাদার নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করে থাকে, যেমন এক নম্বর বালু/ইটের পরিবর্তে তিন নম্বর ইট/ বালু ব্যবহার করা হয়। ফলে দেখা যায় কাজের মান ভাল এবং টেকসই হয় না।[৭২] এছাড়া একটি স্কিম যেভাবে পরিকল্পনা করা হয় বাস্তবায়নের সময় সেই পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্য থাকে না। এর ফলে কাজের গুণগত মান বজায় থাকে না, এবং কাজ টেকসই হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি সেতুর প্রায় ৪০ শতাংশ কাজ পানির নিচে হয়। পরিকল্পনায় পাইলিং যেখানে ৭০ ফুট দেওয়ার কথা সেখানে ৩৫ ফুট দেওয়া হলেও পানির নিচে হওয়ার কারণে তা ধরা যায় না। স্কিম বাস্তবায়ন তদারকির সময় যদি ঠিকাদারের এই অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে ঘুষের বিনিময়ে এটি গোপন করা হয়।

### ৫.২.৭ বিল উত্তোলনের সময় দুর্নীতি

- **বরাদ্দের জন্য প্রকৌশলী কর্তৃক অর্থ আদায়:** এলজিইডি'র একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে কাজ শেষে সেই অর্থ প্রধান কার্যালয় থেকে ছাড় করতে সাধারণত অনেক দেরি হয়। ঠিকাদারদের নিজের অর্থ ব্যয় করে কাজ সম্পন্ন করতে হয় বলে অনেক সময় কাজ বন্ধ রাখতে হয়। ঠিকাদারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রধান কার্যালয় থেকে অর্থ ছাড়করণের চিঠি পাঠালেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে নির্বাহী প্রকৌশলী এ বিষয়ে ঠিকাদারদের না জানিয়ে প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে বরাদ্দ আনার কথা বলে তাদের কাছে অর্থ (কমিশন) দাবি করেন। একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিকাদারের ৫৪ লাখ টাকার বিল পাওয়ার কথা থাকলেও এ ধরনের অর্থ দাবির কারণে ২০ লাখ টাকা বিল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাজেটের বরাদ্দ আসতে দেরি হলে এলজিইডি থেকে নিজের টাকায় কাজ শেষ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়, এবং পরবর্তীতে স্থানীয় এলজিইডি থেকে বিলের টাকা তুলতে এক বছরেরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি জেলার ঠিকাদাররা এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী তাদের কাছ থেকে যেকোনো প্রকল্পের কাজের প্রাক্কলিত মূল্যের ৮.৫% চেকের মাধ্যমে নিয়ে তারপর বিলের চেক-এ স্বাক্ষর করেন বলে অভিযোগ করেন। এ কারণে ছয় মাস ধরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন কাজ আটকে ছিল বলে জানা যায়।[৭৩]
- **ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশন আদায়:** ঠিকাদারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেক ঠিকাদারকে এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমিশন হিসেবে প্রতিটি বিল থেকে দিতে হয় (সারণি ৫.২ দ্রষ্টব্য)।[৭৪]

**সারণি ৫.২: ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশন**

| সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী | ঠিকাদারদের বিল হতে কমিশনের পরিমাণ (শতাংশ/ নগদ টাকা) |
|---|---|
| নির্বাহী প্রকৌশলী | ০.৫% - ১% |
| সহকারী প্রকৌশলী | ১% |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী | ২% - ৩% |
| হিসাবরক্ষক | ১% |
| উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ক্ষেত্র বিশেষে) | ০.৫% |
| প্রকল্প পরামর্শক | ১% |
| উপজেলা প্রকৌশলী | ১% |
| প্রকল্প পরিচালক (ফান্ড রিলিজ) | ১% |
| **মোট** | **৮% - ১০%** |
| **সরকারি অর্থায়নের প্রকল্প হলে অতিরিক্ত কমিশন** | |
| কোষাধ্যক্ষ | ০.৫% |
| **মোট** | **৮.৫% - ১০.৫%** |

*সূত্র:* স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

স্থানীয় পর্যায়ে একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রতিটি স্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে উপস্থিত থাকতে হয় বলে ঠিকাদারকে বিলের ২% থেকে ৩% দিতে হয়। ল্যাবরেটরি টেস্টের জন্য টেকনিশিয়ানকে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। এছাড়া ঠিকাদার যদি কাজের জন্য এলজিইডির রোলার ব্যবহার করে তাহলে দিন অনুযায়ী ভাড়া দিতে হয়। এক্ষেত্রে পাঁচদিন ব্যবহার করে দশদিনের ভাড়ার বিল দাখিল করে এবং বাকি পাঁচদিনের টাকা ঠিকাদার ও এলজিইডি'র মেকানিক্যাল ফোরম্যান (রোলার বরাদ্দ দিয়ে থাকেন) নিয়ে নেয়। এছাড়া সাধারণত প্রকল্পের পরামর্শকদের ১%, নির্বাহী প্রকৌশলীকে ০.৫%-১%, সহকারী প্রকৌশলীকে ১%, হিসাবরক্ষককে ১%, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প হলে কোষাধ্যক্ষকে আরও ০.৫%, উপজেলা প্রকৌশলীকে ১% এবং তহবিল ছাড় করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে ১% অর্থ ঠিকাদারদেরকে তাদের বিল

[৭২] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'সড়কে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২।
[৭৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'কনট্র্যাকটরস অ্যালেজ করাপশন বাই রাঙামাটি এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ার', *দি ডেইলি স্টার*, ১ আগস্ট ২০১১।
[৭৪] উল্লেখ্য, এই হার সকল প্রকল্প এলাকা বা স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

হতে দিতে হয়। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বিলের ০.৫% দিতে হয়। এছাড়া কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিল তোলার সময় বিভিন্ন স্তরে ঘুষ দিতে হয়, যেমন এলজিইডি কার্যালয়ের অফিস সহকারীকে প্রতিবার ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বকশিশ হিসেবে দিতে হয়। ফলে ঠিকাদাররা লাভের অংশ ধরে রাখতে গিয়ে কাজের মান ভাল রাখতে পারে না বা করে না বলে ঠিকাদাররা জানান।

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরে সারা দেশে এলজিইডি থেকে মোট ২৫,৫৬৩ কোটি টাকা বিল হিসাবে ছাড় করা হয়।[৭৫] ওপরে বর্ণিত হিসাবকে (৮.৫% থেকে ১০.৫% ধরে) ভিত্তি ধরে প্রাক্কলন করে দেখা যায় ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত এলজিইডি'র বিল হিসেবে ব্যয়কৃত অর্থ থেকে ২,১৭২.৮৫৫ কোটি থেকে ২,৬৮৪.১১৫ কোটি টাকা কমিশন হিসেবে বিল থেকে আদায় করা হয়েছে।

- **হিসাব মহা নিরীক্ষকের (সিজিএ) কার্যালয়ের দুর্নীতি:** সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের কোনো বিল ছাড়করণের সময় ঠিকাদারদের সিজিএ কার্যালয়ের হিসাবরক্ষককে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। রায় (২০১২)-এর তথ্য অনুযায়ী সিজিএ কার্যালয়ে ঘুষ না দিয়ে কোনো ঠিকাদার বিলের টাকা তুলতে পারে না। ঠিকাদারদের বিলের পরিমাণের ওপর হিসাবরক্ষকদের ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে।[৭৬]
- **জামানত এবং বিলের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা:** পিপিআর অনুযায়ী প্রকল্পের জামানতের টাকা কাজ শেষের ২৮ দিনের পর তোলা যায়। স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী সরকারি প্রকল্পের জামানতের টাকা এক বছরের আগে তোলা যায় না। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ঠিকাদাররা সঠিক সময়ে জামানতের টাকা তহবিলের স্বল্পতার জন্য তুলতে পারে না।

ঠিকাদারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা পাওয়ার কথা, কিন্তু কাজ শেষ করার পর তহবিলের অভাবের কারণে টাকা তোলা যায় না। ফলে দেখা যায় একটি কাজ থেকে যা লাভ হয় সেই টাকা তুলতে পাঁচ-ছয় মাস প্রয়োজন হয় যে কারণে ঠিকাদাররা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বৃহত্তর ফরিদপুর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৮৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৩০টির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঠিকাদাররা প্রায় দশ কোটি টাকার চূড়ান্ত বিল জমা দেন। কিন্তু তহবিলে টাকা না থাকায় এলজিইডি বিল পরিশোধ করতে পারেনি।[৭৭] আরেকটি জেলার একজন ঠিকাদার জানান ২০১২ সালে তিনি ১৩ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন করলেও পাঁচ কোটি টাকা এখনো পাননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে অর্থ ছাড়করণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে বিভিন্ন স্থানে যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এজি অফিস, এবং অর্থ ছাড়ের পর  প্রকল্প পরিচালককে ঘুষ দিতে হয়।

### ৫.২.৮ অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি

তথ্যদাতারা উপরে বর্নিত দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি/ অনিয়ম রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এগুলোর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন নির্মাণ উপকরণের মান যাচাইয়ের জন্য এলজিইডি থেকে ল্যাব টেস্ট করা হয়। ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট ভাল দেওয়ার জন্য ঠিকাদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুষ দিয়ে থাকে, যা কাজের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। স্থানীয় ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী ল্যাব টেস্টের টেকনিশিয়ানকে এ কাজে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এছাড়া টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদনে সঠিক উপকরণ ও মান দেখানো হয়, এবং বিভিন্ন মানের উপকরণ ব্যবহার করা হলেও ল্যাব টেস্টের জন্য ভাল উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

## ৫.৩ অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

### ৫.৩.১ এলজিইডি'র রেটের সাথে বাজারমূল্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেটের পার্থক্য

এলজিইডি'র শিডিউল রেটে যে মূল্য নির্ধারিত তার সাথে বাজারমূল্যের পার্থক্য রয়েছে। সারা দেশের ১৯টি অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিডিউল রেট রয়েছে। এলজিইডি থেকে প্রতিবছর শিডিউল রেট হালনাগাদ করার নিয়ম থাকলেও ২০১২-১৩ অর্থবছরের যে শিডিউল রেট রয়েছে তা ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে এলজিইডি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৯-১০ অর্থবছরের শিডিউল রেট ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ঠিকাদাররা জানান শিডিউল রেট অনুযায়ী একটি তিন কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণ ব্যয় পাঁচ লাখ টাকা ধরা হলেও বর্তমানে এই কাজ করতে প্রয়োজন আট লাখ টাকা। এছাড়া ইটের প্রাক্কলিত মূল্য সাড়ে চার টাকা ধরা হলেও ইটের বাজারমূল্য আট টাকা।

---

[৭৫] এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদনে (২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত) প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রাক্কলিত করা হয়েছে।

[৭৬] ঠিকাদারের বিল অনুযায়ী সিজিএ কার্যালয়ে ঘুষের হার জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৮।

[৭৭] 'কালকিনিতে ১৩৩ কোটি টাকার কাজ: বরাদ্দ না থাকায় ১০৪টি প্রকল্পের কাজ বন্ধ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ জানুয়ারি ২০১৩। একই ধরনের সমস্যার জন্য দেখুন 'কালকিনি-মিয়ারহাট সড়ক: ছয় মাসের কাজ ৩২ মাসেও শেষ হয়নি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ জানুয়ারি ২০১৩; 'সোয়া তিন কোটি টাকার কাজে দুই বছরে বরাদ্দ মাত্র আট লাখ টাকা: দুই বছর ধরে ঝুলে আছে চার ইউপির নির্মাণকাজ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০১২; 'অর্থাভাবে ব্রিজ নির্মাণ কাজ বন্ধ', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭ অক্টোবর ২০০৯।

তথ্যদাতাদের মতে, এলজিইডি শিডিউল রেট নির্ধারণ করার জন্য ফেব্রুয়ারি/ মার্চ মাসে মাঠ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি দলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপকরণের দাম সংক্রান্ত তিন ধরনের তথ্য অর্থাৎ সর্বোচ্চ দাম, সর্বনিম্ন দাম এবং বর্তমান দাম সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিডিউল রেট তৈরি করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে, বাজার ব্যবস্থা অস্থিতিশীলতার কারণে উপকরণের দাম প্রায় প্রতি মাসেই বৃদ্ধি পায়। ক্ষেত্রবিশেষে ঠিকাদারদের দুই বছরের পুরানো রেটে কাজ করতে হয়েছে। ফলে তারা লাভের জন্য নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ট্রাকে পাঁচ হাজার ইটের মধ্যে এক হাজার ইট ভালো মানের হলে চার হাজার ইট খারাপ মানের হয়ে থাকে। এছাড়া ঠিকাদাররা সরকারের কাছ থেকে বিটুমিন কিনছে ১০,৫০০ টাকা হারে কিন্তু শিডিউল রেট অনুযায়ী তাদের সরকারের কাছেই (এলজিইডি'র কাজের জন্য ব্যবহার অর্থে) বিক্রি করতে হচ্ছে ৮,৫০০ টাকায়। ফলে একটি কাজের ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় তখন নির্মাণ সামগ্রীর যে বাজারদর থাকে, প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার পর দেখা যায় প্রাক্কলিত মূল্য থেকে বাজারদর বেড়ে যায়, যা রেটে প্রতিফলিত হয় না। আবার যখন শিডিউল রেট অনুযায়ী দরপত্র দাখিল করা হয় তখন কাজ শুরু হয় না; কাজের আদেশপত্র পেতে সাত থেকে আটমাস সময় ব্যয় হয়। ইতোমধ্যে উপকরণের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই), সড়ক ও জনপথ (সওজ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের রেটের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় এলজিইডি'র কাজের জন্য নির্ধারিত একক মূল্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একক মূল্যের চাইতে অনেক কম, ফলে ঠিকাদাররা কম লাভের কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে আগ্রহী হয় না বা কাজ করলেও সেক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

### ৫.৩.২ বাজেট সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

এলজিইডি'র বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী এক বছরের বাজেটের ৩০% বরাদ্দ পাওয়া যায়, ফলে তিন বছরে এক বছরের সম-মানের কাজ করা হয়। ফলে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। বাজেটের সীমাবদ্ধতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[৭৮] একই কারণে কাজের মান ঠিক রাখা যায় না এবং সময় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যায়। ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে কাজ করতে ঠিকাদাররা বেশি পছন্দ করে কারণ এসব প্রকল্পের টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

### ৫.৩.৩ ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া

এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে অতিরিক্ত ছাড়কৃত অর্থ বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও তা করা অনেক ক্ষেত্রে করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো'-এর প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত রাজস্ব খাতে টাকার পরিমাণ ২৭২.৯৬৬৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ সরকারি খাতে প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা ৪.১৮০১ কোটি টাকা অতিরিক্ত ছাড় করা হয়েছে, কিন্তু তা পরবর্তীতে সরকারি কোষাগারে জমা পড়েনি।

## ৫.৪ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

### ৫.৪.১ নির্ধারিত ছক ব্যবহার করার কারণে গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া

নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ওপর ভিত্তি করে পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায় এসব নির্দেশকের ভিত্তিতে শুধু পরিমাণগত তথ্য পূরণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া যায় না এবং কাজের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না।

### ৫.৪.২ প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শকের ওপর প্রকৌশলীর প্রভাব

বাস্তবায়িত প্রকল্পের মূল্যায়ন করার জন্য এলজিইডি পরামর্শক নিয়োগ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের মতে একটি প্রকল্পের সবগুলো স্কিম পরামর্শকরা পরিদর্শন করেন না, বরং এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সুপারিশ অনুযায়ী পরামর্শকরা প্রকল্পের বিভিন্ন স্কিম পরিদর্শন করেন। ফলে কোনো প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন সম্পর্কে পরামর্শকদের ধারণা তৈরি হয় না। এমনকি ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী এবং পরামর্শকরা মাঠ পরিদর্শন না করে পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন দেন বলে তথ্যদাতারা জানান।

### ৫.৪.৩ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ঘাটতি

প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন - এ তিনটি পর্যায়েই এলজিইডি'র ঘাটতি রয়েছে। এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয়ে একইসাথে কমপক্ষে ২০টি প্রকল্পের অধীনে শতাধিক স্কিমের কাজ চলে, তাই এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের পক্ষে সব প্রকল্প পরিদর্শন করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। একইভাবে আইএমইডি'র পক্ষ থেকে সকল প্রকল্প মূল্যায়ন করা হলেও

---

[৭৮] 'কালকিনিতে ১৩৩ কোটি টাকার কাজ: বরাদ্দ না থাকায় ১০৪টি প্রকল্পের কাজ বন্ধ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ জানুয়ারি ২০১৩; 'কালকিনি-মিয়ারহাট সড়ক: ছয় মাসের কাজ ৩২ মাসেও শেষ হয়নি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ জানুয়ারি ২০১৩; 'সোয়া তিন কোটি টাকার কাজে দুই বছরে বরাদ্দ মাত্র আট লাখ টাকা: দুই বছর ধরে ঝুলে আছে চার ইউপির নির্মাণকাজ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০১২; 'অর্থাভাবে ব্রিজ নির্মাণ কাজ বন্ধ', *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭ অক্টোবর ২০০৯।

সকল স্কিম পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় না। আইএমইডি কেবল ১৫-২৫% স্কিমপরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট স্কিমের মূল্যায়ন করা হয় না, যদিও সচিব কর্তৃক অভ্যন্তরীণ আদেশের মাধ্যমে সহ পরিচালক এবং উপ-পরিচালকদের প্রতি মাসে তিনটি এবং পরিচালকদের দুটি প্রকল্প পরিদর্শনের নিয়ম রয়েছে।

**চিত্র ৫.২: আইএমইডি'র সীমিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদাহরণ**

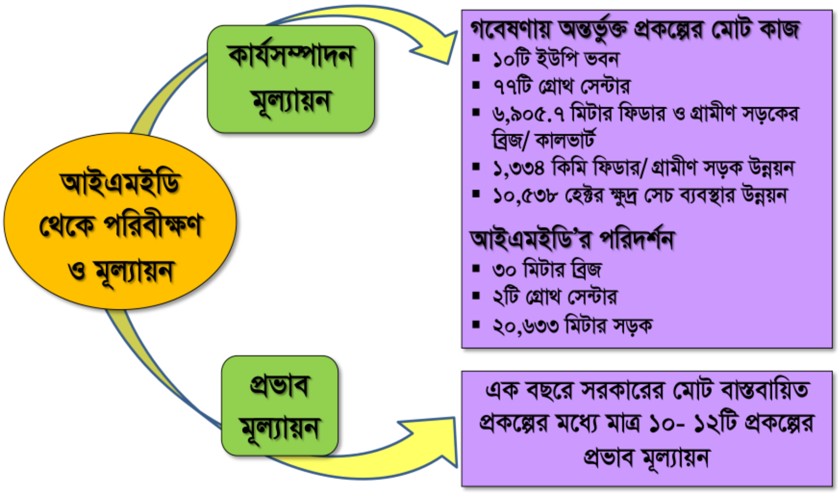


উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো'-এর আওতায় দশটি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, ৭৭টি গ্রোথ সেন্টার, ৬,৯০৫.৭ মিটার ফিডার এবং গ্রামীণ সড়কের সেতু/ কালভার্ট, ১৩৩৪ কিমি ফিডার/ গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন, ১০,৫৩৮ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ২৬৯ কিমি ফিডার/ গ্রামীণ সড়ক পেভমেন্ট দ্বারা উন্নয়নের বিষয়টি প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে আইএমইডি শুধু ৩০ মিটার সেতু পরিদর্শন, দুইটি গ্রোথ সেন্টার ও ২০,৬৩৩ মিটার সড়ক পরিদর্শন করে, এবং এই পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে উক্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেয়। আইএমইডি'র তথ্যদাতাদের মতে, এক বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১২টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে কতগুলো স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কিনা, এবং এসব কাজের মান কেমন তা ধরা পড়ে না।

### ৫.৪.৪ টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ না করা

তথ্যদাতাদের মতে, এলজিইডি'র যেহেতু টেকনিক্যাল কাজ করে থাকে সেহেতু আইএমইডি'র কর্মকর্তারা অনেক বিষয় বুঝতে পারেন না। তাই পরিবীক্ষণও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না।

### ৫.৪.৫ প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত

কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় বলে জানা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে চেয়ারম্যান, সদস্য ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এলজিইডি এবং সুবিধাভোগীরা এক বছর পর্যন্ত প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তারপর শুধুমাত্র সুবিধাভোগীরা তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তথ্যদাতাদের মতে, একটি জেলায় এলজিইডি'র রেগুলেটর/স্লুইস গেট নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ছয়-সাতমাস পর তা অকার্যকর হয়ে যায়, কারণ কমিটির সদস্যদের আগ্রহ পাঁচ-ছয়মাস পর হ্রাস পায়। রেগুলেটর/স্লুইস গেটের রাবার, হাতল নষ্ট হয়ে যায় এবং তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পরে। পরবর্তীতে নতুন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি আবার নতুনভাবে এই প্রকল্পটি হাতে নেয়। তথ্যদাতার মতে এক কোটি টাকার একটি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্পের স্থায়িত্ব ৩০ বছর হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হয় না।

**বক্স ৮: ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সমবায় সমিতির অবস্থা**

২০০০ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একটি অঞ্চলে জলকপাট (স্লুইস গেট) নির্মাণ করা হয়েছিল। এই জলকপাট তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা ছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সমিতির সভাপতি ৪৫ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং সমিতির সদস্যরা তাদের টাকা ফেরৎ পাননি। বর্তমানে একজন সভাপতি রয়েছে কিন্তু কোনো ধরনের সভা (মাসিক, বাৎসরিক, সাধারণ, জরুরি) অনুষ্ঠিত হয় না। বর্তমানে একজন ব্লক সুপারভাইজার (বিএডিসি), যিনি একসময় সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি এই জলকপাট খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। এলজিইডি থেকে কোনো ধরনের তদারকি করা হয় না, তবে মাঝেমধ্যে এলজিইডি'র কর্মকর্তারা এসে সভাপতির সাথে কথা বলে যায়।

***তথ্যসূত্র:*** *একটি ক্ষুদ্র পানিসম্পদ প্রকল্প সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে*

## ৫.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের সমঝোতার মাধ্যমে হিসেবে দরপত্র ও কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবেও এলজিইডি'কে ব্যবহার করা হচ্ছে বিপুল বৈদেশিক সহায়তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। আরও দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে 'কমিশন' সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে, এবং এর ফলে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম যেমন প্রকল্পের স্কিমের মূল্য প্রাক্কলনে অনিয়ম, সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করা, কার্যাদেশ পাওয়ার পর দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের বাজেট থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে না, ফলে এলজিইডি'র কাজের যে প্রভাব থাকার কথা তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

পরবর্তী অধ্যায়ে এলজিইডি'তে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণ ও এর প্রভাব কী তা আলোচনা করার সাথে সাথে এ থেকে উত্তরণের জন্য কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

*অধ্যায় ছয়*

# উপসংহার ও সুপারিশ

## ৬.১ উপসংহার

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এলজিইডি'কে একটি সফল প্রতিষ্ঠান বলা যায়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীণ অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধনের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি লক্ষণীয়, যা সম্ভব হয়েছে কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে, এবং যা জাতীয় উৎপাদনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে (যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা) গ্রামীণ জনগণের প্রবেশ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে দেখা যায় এলজিইডি'র কিছু আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন নিয়োগ ও পদায়নের জন্য এলজিইডি'র নিজস্ব কোনো বিধি, নীতিমালা বা কমিটি নেই, যার এসব ক্ষেত্রে অনিয়মের সুযোগ করে দিচ্ছে। এলজিইডি'তে প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে বলে দেখা যায়। জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যা ও অনিয়ম রয়েছে যেমন উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং পরামর্শক নিয়োগে অনিয়ম। এছাড়া অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লজিস্টিকস যেমন কম্পিউটার ও গাড়ি ব্যবহার করা হয়। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা থেকে বেশ কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম টাকা কর্তন, বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম আদায়, অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা-বহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়, এবং আত্মসাৎ। এছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশেও কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

এলজিইডি'র প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। এসব অনিয়মের মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের ধারণা হতে বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা এবং একাধিকবার সংশোধন, এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন। এসব সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভাবিত হয়।

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এলজিইডি'তে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। দেখা যায়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'কে ব্যবহার করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে (সংসদে) প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত বিপুল বৈদেশিক সহায়তা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এলজিইডি'র স্থানীয় কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের সমঝোতা লক্ষ করা যায়, এবং মাধ্যম হিসেবে দরপত্র ও কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবেও এলজিইডি'কে ব্যবহার করা হচ্ছে বিপুল বৈদেশিক সহায়তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দানের মাধ্যমে। আরও দেখা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে 'কমিশন' সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে, এবং এর ফলে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম যেমন প্রকল্পের স্কিমের মূল্য প্রাক্কলনে অনিয়ম, সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করা, দরপত্র মূল্যায়নের সময় বা কার্যাদেশ পাওয়ার পর দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের বাজেট থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে না, ফলে এলজিইডি'র কাজের যে প্রভাব থাকার কথা তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

## ৬.২ এলজিইডি'তে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

এলজিইডি'তে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায়।

### ৬.২.১ *দলীয়করণ*

এলজিইডি'তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রশাসনিক পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবে স্থানীয় পর্যায়েও প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হচ্ছে, যেহেতু বর্তমান জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে 'বিজয়ীরাই সবকিছু ভোগ করবে'। আকরামের (২০১২) গবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় পর্যায়ে সব ধরনের সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। এই নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান সংসদে পূর্ব

অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ২০০৯' আইন হিসেবে প্রণীত হয়, যেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই দুই কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়, এবং বলা হয় ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয়কার্যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না।[৭৯]

### ৬.২.২ *স্বচ্ছতার অভাব*

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এলজিইডি'তে জনবল ব্যবস্থাপনার অধীনে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রচলন না হওয়ার কারণে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে উন্মুক্ত ও সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যাদেশ প্রদান নিশ্চিত হয়নি। এছাড়া প্রশাসনিক ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর তথ্য প্রকাশের অভাবে স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

### ৬.২.৩ *প্রয়োজনীয় ও টেকনিক্যাল জনবলের অভাব*

এলজিইডি'র কার্যক্রম নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (এলজিইডি, আইএমইডি) প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এসব অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে দক্ষ জনবলের অভাব[৮০] ও সীমিত নিরীক্ষার আওতা, ফলে বিশেষকরে রাজস্ব বাজেটের অধীনে ব্যয়ের নিরীক্ষার অভাবে এ খাতে দুর্নীতির সুযোগ বেশি।

### ৬.২.৪ *বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যতার অভাব*

প্রক্রিয়াগত কারণে এলজিইডি'র শিডিউল রেটের সাথে বাজারমূল্যের পার্থক্য দেখা যায়, যার ফলে ঠিকাদাররা বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

### ৬.২.৫ *দীর্ঘসূত্রতা*

এলজিইডি'তে প্রকল্পের ধারণা হতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা এবং একাধিকবার সংশোধন ইত্যাদির সুযোগ তৈরি হয় যা পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। এছাড়া বাজেট বরাদ্দ ও ছাড়করণেও দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে।

### ৬.২.৬ *তদারকির অভাব*

এলজিইডি'তে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, জনবল ব্যবস্থাপনা, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, বিভিন্ন লজিস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ফলে এটি আরও বেশি করে ক্ষমতাসীন দলের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

## ৬.৩ এলজিইডি'র কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব

এলজিইডি'তে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি, প্রকল্প প্রণয়ন, পিপিআর-এ পরিবর্তন, দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া, আর্থিক অনিয়ম, বাস্তবায়নে অনিয়ম, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারে প্রভাব ফেলে। এসব অনিয়মের নিম্নলিখিত সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিহ্নিত করা যায়।

### ৬.৩.১ *প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন না হওয়া*

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী, রাজনীতিক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের কারণে জনগণের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন হতে পারছে না, যার ভুক্তভোগী সাধারণ গ্রামীণ জনগণ। এ কারণে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি হচ্ছে না ফলে গ্রামীণ অবকাঠামো যে পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কথা ছিল সে পর্যায়ে যেতে পারছে না, এবং জনগণ এর সুফল পুরোপুরি পাচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেখানে সড়ক প্রয়োজন সেখানে সেতু নির্মাণ হচ্ছে।[৮১]

### ৬.৩.২ *আর্থিক ক্ষতি*

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বাড়ার সাথে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ে। দেখা যায় ২০১১ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র যেসব প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে বা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর মূল বরাদ্দ বা মূল বাস্তবায়নের সময় ঠিক রাখা যায়নি। সমাপ্ত ৮১টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে এবং ১৬৫টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকাল বেড়েছে। ২৫৭টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল গড় প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১৫.৬৪ কোটি টাকা, যার বিপরীতে প্রকৃত গড় ব্যয় হয়েছে ১৮৯.৩০ কোটি টাকা। ফলে এসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৮৬৫০.৬২ কোটি টাকা

---

[৭৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ২০০৯' (সূত্র: 'সংসদে বিল পাস: অভিজ্ঞতা ছাড়াই দুই কোটি টাকার টেন্ডারে অংশ নেয়া যাবে', *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ নভেম্বর ২০০৯)।

[৮০] আইএমইডি'র ২০১০ সালে প্রকাশিত নাগরিক সনদ অনুযায়ী আইএমইডি'তে মোট ২৭০টি পদের মধ্যে (১৩৫ জন কর্মকর্তা ও ১৩৫ জন কর্মচারী) ৮৯ জন কর্মকর্তা ও ১১১ জন কর্মচারী নিযুক্ত, অর্থাৎ ২৭০টি পদের মধ্যে মোট ৭০টি পদ শূন্য ছিল।

[৮১] 'সংযোগ সড়ক না থাকায় কাজে আসছে না সেতুটি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩; 'দরকার সড়ক, হচ্ছে একের পর এক সেতু', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর ২০১১।

প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে। অন্যদিকে এসব প্রকল্পের মূল পরিকল্পিত গড় বাস্তবায়নকাল ছিল ৩.৪৮ বছর, যার বিপরীতে প্রকৃত গড় বাস্তবায়নকাল দাঁড়িয়েছে ৬.১৯ বছর।[৮২]

চিত্র ৬.১: এলজিইডি'তে অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

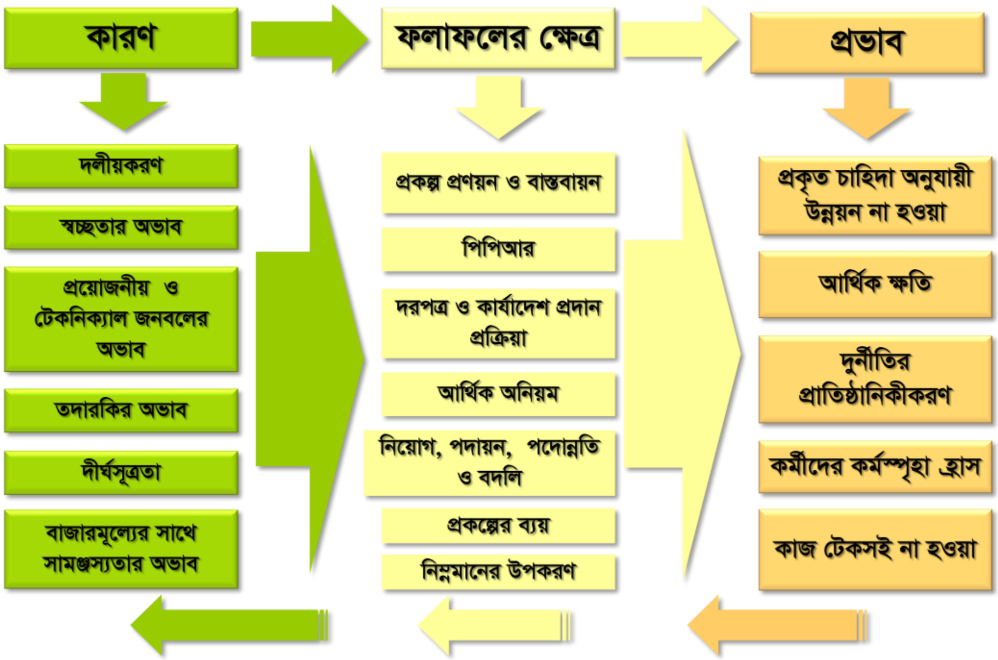


এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এসব উন্নয়ন সহযোগীদের দেওয়া ঋণের প্রতিটি কিস্তির জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্ত পূরণ না করলে অর্থছাড়ের জন্য প্রতিটি কিস্তি থেকে 'কমিটমেন্ট ফি' হিসেবে জরিমানা কেটে নেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংক প্রতিটি কিস্তির ছাড়ের জন্য ০.৫ শতাংশ 'কমিটমেন্ট ফি' কেটে রাখে যদি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা মেনে চলা না হয়। অর্ডিনারি ক্যাপিটাল রিসোর্স (ওসিআর) এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ০.৭৫ শতাংশ 'কমিটমেন্ট ফি' কেটে রাখে। সরকারকে একটি অর্থবছরের প্রতি ছয় মাসে এই 'কমিটমেন্ট ফি' পরিশোধ করতে হয়। দেখা যায় ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বাংলাদেশ সরকারকে ছয় বছরে (২০০৪ এর জানুয়ারি থেকে ২০০৮ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) প্রায় ১২৭ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগীদের দিতে হয়।[৮৩]

### ৬.৩.৩ *দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ*

রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের দুর্বলতার কারণে এলজিইডি'তে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। দেখা যায় যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অবৈধভাবে এলজিইডিকে ব্যবহার করছেন এবং এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মবদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকল্প কাজের টেন্ডার প্রকাশ থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিল উত্তোলনসহ প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও এলজিইডি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের কিছু অলিখিত প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন সিজিএ ও সিএজি কার্যালয়েও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে দেখা যায়।

### ৬.৩.৪ *কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহা হ্রাস*

জনবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এলজিইডি'র রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহা হ্রাস পায় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের কাছ থেকে জানা যায়।

### ৬.৩.৫ *কাজ টেকসই না হওয়া*

এলজিইডি'র শিডিউল রেটের চেয়ে বাজারমূল্য বেশি থাকে। বাজার স্থিতিশীল না থাকার কারণে ঠিকাদারদের কাজ করতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এবং নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। তারপরও কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদাররা কাজ করতে বাধ্য, তা না হলে জামানতের ১০% টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। ঠিকাদারদের মতে, ২০%-২৫% ঘুষ দিয়ে এই বাজেটে

---

[৮২] জাফর আহমেদ চৌধুরী, 'এডিপি বাস্তবায়নে ধীরগতি ও জাতীয় ক্ষতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ এপ্রিল ২০১২।
[৮৩] রেজাউল করিম বায়রন, 'ডিলেস ইন প্রজেক্টস ব্লিড পাবলিক কফার: গভ. হ্যাড টু পে ডোনরস টাকা ১২৭ ইন লাস্ট সিক্স ইয়ারস অ্যাজ 'কমিটমেন্ট ফিস', *দি ডেইলি স্টার*, ৪ মে ২০১০।

মানসম্মত কাজ করা সম্ভব নয়। কাজ শেষ না করে ঠিকাদার তার কাজের সব টাকা তুলতে পারে না। এতে অনেক সময় অর্ধেক কাজ করার পর কাজ বন্ধ রাখতে হয়। পরে আবার যখন কাজ শুরু করা হয় তখন কাজের গুণগত মান (টেম্পার) ধরে রাখা সম্ভব হয় না (দেখুন বক্স ৯)। উদাহরণ হিসেবে চাঁদপুর জেলায় এলজিইডি নির্মিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। নির্মাণের দুই/তিন বছর যেতে না যেতেই কোনো কোনো ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ প্রকাশিত হয়।[৮৪]

**বক্স ৯: এলজিইডি'র নিম্নমানের কাজের প্রভাব**

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কয়েক বছরের মাথায় সারাদেশের বেশিরভাগ ব্রিজ-কালভার্টেই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক রিপোর্ট অনুসারে 'গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কের ওপর বড় ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে যেসব ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে তার ৮৯ শতাংশই বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ ও অসমাপ্ত। প্রায় ৮২ শতাংশ ব্রিজ-কালভার্ট চালু থাকলেও এগুলোতে কোনো না কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে। এছাড়া ৭ শতাংশ ব্রিজ-কালভার্ট অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের (এলজিইডি) আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়ন হয়। এতে মোট ব্যয় হয় প্রায় ২৫৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০৯টি ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আইএমইডির পরিদর্শনকালে ৬৪ শতাংশ ব্রিজের এপ্রোচ সড়কে সমস্যা পাওয়া গেছে। যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচ সড়ক নষ্ট হয়ে গেছে অথবা কোনো কোনো জায়গায় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

আইএমইডির একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ ব্যাপারে বলেন, এসব ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের ফলে স্থানীয় জনগণ নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ-কালভার্টে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এগুলোর স্থায়িত্ব আদৌ কতদিন হবে এখন সে প্রশ্ন উঠেছে। এগুলো ঠিকভাবে নির্মাণ না করার কারণেই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর পেছনে আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি বিষয়টি জড়িত থাকতে পারে। নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই ব্রিজ-কালভার্টগুলোর নির্মাণ কাজ নষ্ট হয়ে গেছে।

***সূত্র:*** *দৈনিক যুগান্তর*, ৮ আগস্ট ২০১০

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র অর্জন ইতিবাচক, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি না থাকলে দক্ষতা, সক্ষমতা ও অর্জন আরও বেশি থাকতে পারত। এলজিইডি'তে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির পেছনে দুই ধরনের নিয়ামক চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে বাহ্যিক নিয়ামক যেমন দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (সিজিএ, সিএজি, আইএমইডি), অস্থিতিশীল বাজার, দীর্ঘসূত্রতা (প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থছাড়) ইত্যাদি এলজিইডি'র নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অন্যদিকে জনবল ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, তদারকির অভাব, নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাব, স্বচ্ছতার অভাব (ই-প্রকিউরমেন্ট চালু না হওয়া) এলজিইডি'র দুর্নীতির অভ্যন্তরীণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এলজিইডি'কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সুবিধা আদায় করার জন্যও এলজিইডি'কে ব্যবহার করা হয়। এলজিইডি'তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিল থেকে কমিশন আদায়, ল্যাব টেস্টে অর্থ আদায়) দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলেও লক্ষ করা যায়।

### ৬.৪ সমস্যা থেকে উত্তরণে এলজিইডি'র গৃহীত পদক্ষেপ

সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এলজিইডি ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- **জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদকরণ:** এলজিইডি'র প্রতিষ্ঠালগ্নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জেলা পরিষদ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত বিভাগ এবং পূর্ত কর্মসূচি উইং-এর কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োজিত করা হয়েছিল ফলে জ্যেষ্ঠতার তালিকা নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ২০০৮ সালে জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। তবে বর্তমানে জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। সরকারি কর্ম কর্মশনের মাধ্যমে এলজিইডি'তে সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। তাই ১৯৮৮ সালের পূর্বে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা শীঘ্র অবসরে চলে যাবেন বলে এলজিইডি'র কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন। ফলে জ্যেষ্ঠতার তালিকা নিয়ে তাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না বলে আশা করা যায়।
- **মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ:** ইতোপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের ১৯টি মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে ১,৬৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ করা হয়। বর্তমানে ৪৭টি মামলার অধীনে ২,৪২০ জনকে রাজস্ব খাতে আত্তীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
- **অভিযোগ-সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ:** কর্তব্যে অবহেলা বা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শন টিম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে অপরাধভেদে এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন বা প্রশাসনিক কাজ পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়, এবং সন্তোষজনক জবাব প্রদানে অক্ষমতার ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্তের পর বিভাগীয় মামলা দায়েরসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা

[৮৪] 'এলজিইডি'র কাজের মান নিয়ে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে চরম অসন্তোষ', *দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ*, ২১ জুলাই ২০০৯।

হয়। এছাড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতেও এলজিইডি ব্যবস্থা নেয় বলে জানা যায়। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার পাশাপাশি ক্রটি সংশোধন। উল্লেখ্য, 'শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫'-তে উল্লিখিত অপরাধের ধরন অনুযায়ী লঘু ও গুরুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১১ এর জুলাই থেকে ২০১২ এর জুন পর্যন্ত সময়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ৩০টি ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৬৫টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মোট ১৩ জনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩০ জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং ৫২টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।[৮৫]

- **কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:** দক্ষ, অভিজ্ঞ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ও মানব সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এলজিইডি। প্রশিক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে দশটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ১৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণসহ বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ও কর্মশালায় সুযোগ প্রদান করা হয়।
- **সব ক্রয় কার্যক্রম ই-গভার্নেন্সের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু:** দরপত্রে প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২ জুন ২০১১ ই-গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির প্রর্বতন করে। প্রাথমিকভাবে যে চারটি সংস্থায় ই-জিপি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এলজিইডি তাদের মধ্যে একটি। তথ্যদাতাদের মতে এলজিইডিতে ই-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির অধীনে ই-টেন্ডারিং-এর পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চারটি ক্রয়কারী দপ্তরকে (সদর দপ্তর, ঢাকা, সিলেট, গোপালগঞ্জ) প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে এর ফলে ক্রয় কার্যের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব ক্রয় কার্যক্রম ই-গভার্নেন্সের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:** প্রতিটি সড়ক ও সেতু/কালভার্ট-এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য Portable Weigh Bridge, Benkelman Beam প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সহায়তায় নানা ধরনের সার্ভে যেমন রোড কন্ডিশন সার্ভে, রাফনেস সার্ভে, ডিফ্লেকশন সার্ভে করা হয়। এসব জরিপের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়।
- **কাজের মান নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উপকরণসমূহের (সিমেন্ট, ইট, এগ্রিগেট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন ও মাটির বিভিন্ন পরীক্ষা) মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা পর্যায়ে এলজিইডি'র ৬৫টি (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি, আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪টি ও জেলা পর্যায়ে ৫০টি) নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এসব ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব খাত হতে ৭৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া এই ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলী ও ল্যাবরেটরি টেকশিয়ানদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- **জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) মানচিত্রের উন্নয়ন:** এলজিইডি'র জিআইএস মানচিত্র রয়েছে যার মাধ্যমে এলজিইডি'র রাস্তা, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতির অবস্থান ও চাহিদা চিহ্নিত করা যায়। এর ফলে নতুন কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা দ্রুত করা সম্ভব হয়।
- **আঞ্চলিক শিডিউল রেট প্রবর্তন ও হালনাগাদকরণ:** প্রায় প্রতিবছর শিডিউল রেট হালনাগাদ করার নির্দেশনা রয়েছে। তবে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন বাজার মূল্যের সাথে শিডিউল রেটের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পার্থক্য হয়নি তাহলে হালনাগাদ করা হয় না। এলজিইডি হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার সারা দেশে ১৯টি অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিডিউল রেট রয়েছে। অঞ্চলগুলোর বাজার মূল্য যাচাই করে এসব শিডিউল রেট নির্ধারণ করা হয়।
- **কার্যক্রমে নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও আওতা নির্ধারণ:** সার্বিকভাবে এলজিইডি'র কার্যক্রমে (ডিজাইন, নির্মাণ) একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও এর আওতা নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং এই প্রক্রিয়া চলমান।

### ৬.৫ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ওপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এলজিইডি'র সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

#### ক. নীতি নির্ধারণী পর্যায়

১. সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে

[৮৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১-১২, পৃ ৫।

সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ কাজ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন বা সংশোধনের সময় অপরিকল্পিতভাবে বরাদ্দহীন ও অননুমোদিত 'রাজনৈতিক' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

২. এলজিইডি'র জন্য মানবসম্পদ ইউনিট গঠন করতে হবে, যা প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো পালন করবে। এই মানবসম্পদ ইউনিট জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদ করার সময় পুরানো তালিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি সংক্রান্ত সুপারিশ করবে, এবং সার্বিকভাবে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

৩. উন্নয়ন বাজেটের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রকল্পের নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগত (টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে করানো ও সরেজমিন) এবং পরিমাণগত (বেশি সংখ্যক) মান বাড়াতে হবে।

৫. কর্মকর্তা- কর্মচারীদের ইতিবাচক (ক্যাডারভুক্ত, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করণ)ও নেতিবাচক (তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ) প্রণোদনা দিতে হবে।

**খ. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়**

৬. এলজিইডি'র বিদ্যমান জবাবদিহিতার পদ্ধতি আরও শক্তিশালী করতে হবে।

৭. এলজিইডি'র নিজস্ব নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. এলজিইডি'র সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রতিবছর প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞাত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন সম্পদের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. প্রকল্পভিত্তিক লজিস্টিকস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যেন প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে এসব লজিস্টিকস স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

১০. ব্যক্তিগত ও সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি নীতিমালা মেনে চলতে হবে। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

**গ. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত**

১১. যে প্রকল্পের মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবে সে প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

১২. বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্রে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

১৩. ই-প্রকিউরমেন্ট ও ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সব পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

**ঘ. তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত**

১৪. এলজিইডি'র নাগরিক সনদ হালনাগাদ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ এলজিইডি'র স্থানীয় পর্যায়ের সবগুলো কার্যালয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. এলজিইডি'র প্রতিটি প্রকল্প ও স্কিমের তথ্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের (যেমন সচেতন নাগরিক কমিটি) তদারকি ও সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক সামাজিক জবাবদিহিতার মাধ্যম ব্যবহার করে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

## তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী


অর্থবিভাগ, ২০০৯, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আকরাম, শম, ২০১২, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', টিআইবি, ঢাকা।

কাদের, আকমফ, ২০১০, 'প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়', পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ঢাকা (সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার শীর্ষক সেমিনারে ১৬-১৭ জুন ২০১০ তারিখে উপস্থাপিত প্রবন্ধ)।

পরিকল্পনা কমিশন, *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত)।

মাহমুদ, ত, ২০০৬, *করাপশন ডেটাবেজ ২০০৫*, টিআইবি, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০১২, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১-১২, ঢাকা।

রায়, দ, ২০১২, 'হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: উত্তরণের উপায়', টিআইবি, ঢাকা।

Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC), 2012, 'Emergency 2007 Cyclone Recovery and Reconstruction Project', Dhaka.

Chadha, S, 1989, *Managing Projects in Bangladesh: A Scenario Analysis of Institutional Environment for Development Projects*, University Press Limited, Dhaka.

Economic Relations Division, 2010, 'GOB Project Approval Process: A Scoping Study', Ministry of Finance, Government of Bangladesh.

Fujita, Y, 2011, *What Makes the Bangladesh Local Government Engineering Department (LGED) So Effective?*, JICA Research Institute, No.27; January.

Pallas, CL & Wood, J, 2009, 'The World Bank's Use of Country Systems for Procurement: A Good Idea Gone Bad?' *Development and Policy Review, 2009*, Overseas Development Institute, Blackwell Publishing, USA.

Population Services and Training Center (PSTC), 2012, 'Placing Vulnerable Groups at the Centre of Result Monitoring project Supported by World Bank: Citizen Report Card', Dhaka.

Rives, J M. & Heaney, M T, 1995, Infrastructure & Local Economic Development, *Regional Science Perspectives*; Vol.25, No.1.

Sing, VK, 1983, *Infrastructure & Development in India: A study of Regional Variations*, CSRD/SSS, JNU, New Delhi.

Stansbury, C & Stansbury, N, 2008, 'Examples of Corruption in Infrastructure', Global Infrastrcture Anti-corruption Centre, http://www.giaccentre.org/documents/GIACC.CORRUPTIONEXAMPLES.pdf (8 February 2013).

USAID, 1978, 'Department of Local Government & Community Development- Rural Roads Program, Republic of the Phillippines, Rural Roads Evaluation Report', Republic of the Phillippines.

**পরিশিষ্ট ১: পরিদর্শনকৃত স্কিম**

| জেলা | উপজেলা | বাজার (গ্রোথ সেন্টার) (সংখ্যা) | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন (সংখ্যা) | রাস্তা, কালভার্ট, সেতু (সংখ্যা) |
|---|---|---|---|---|
| কুমিল্লা | কুমিল্লা সদর, লাকসাম, নাঙ্গলকোট, হোমনা | ২১ | ৪ | ১৯ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাসিরনগর, কসবা | ৯ | --- | ১৪ |
| চাঁদপুর | চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া | ১৫ | ২ | ২৪ |
| **মোট: ৩** | **মোট: ৯** | **মোট: ৪৫** | **মোট: ৬** | **মোট: ৫৭** |
| | | **সর্বমোট পরিদর্শনকৃত স্কিম = ১০৮** | | |

## পরিশিষ্ট ২: এলজিইডি'র অর্গানোগ্রাম

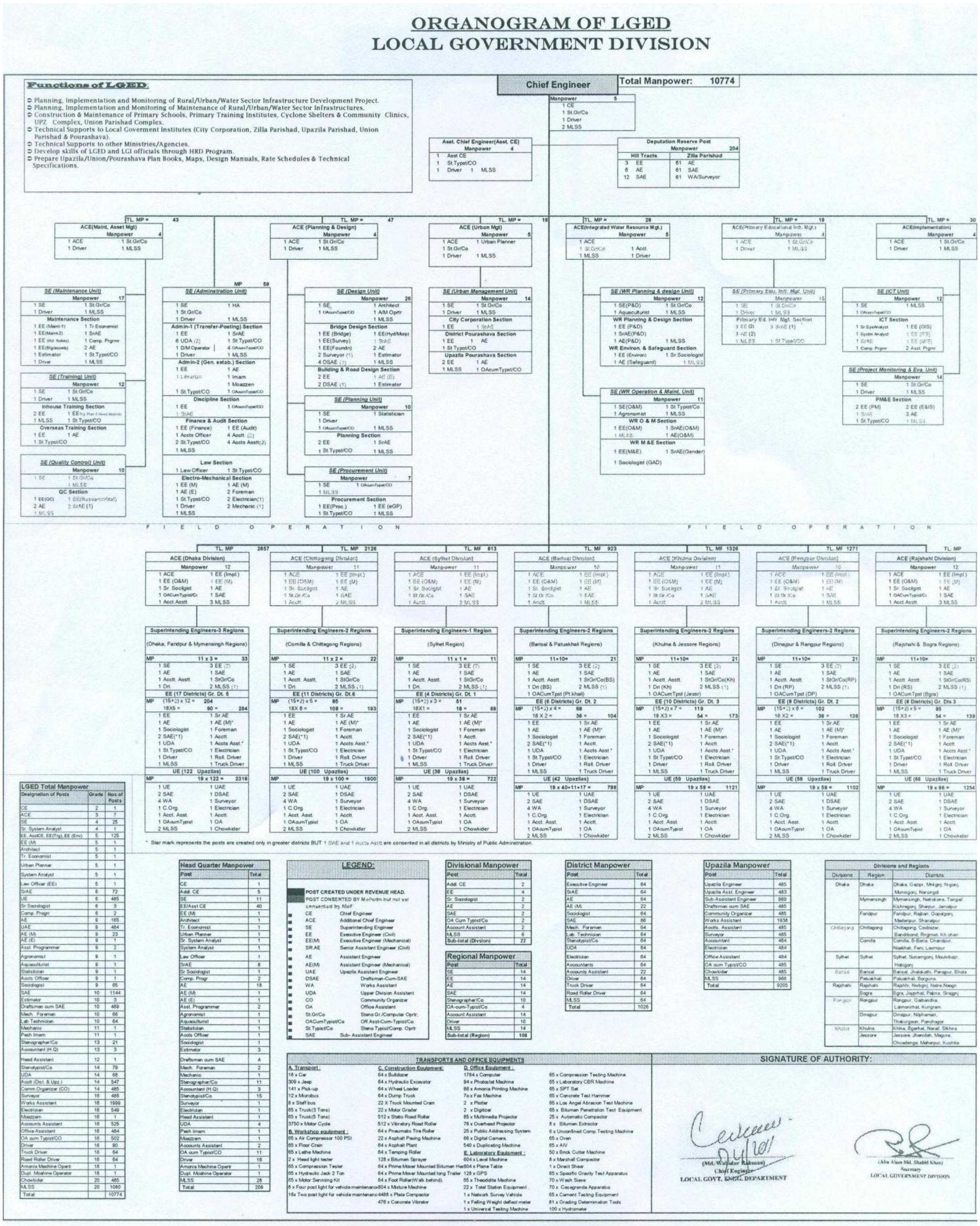

### পরিশিষ্ট ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) এলজিইডি'র বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

| অর্থবছর | উন্নয়ন বরাদ্দ |
|---|---|
| ২০০৩-০৪ | ২,৯২৯ |
| ২০০৪-০৫ | ৩,১৭৩ |
| ২০০৫-০৬ | ৪,৪৫৪ |
| ২০০৬-০৭ | ৪,৮১৬ |
| ২০০৭-০৮ | ৪,৩০৭ |
| ২০০৮-০৯ | ৪,৬৯৯ |
| ২০০৯-১০ | ৫,৮২১ |
| ২০১০-১১ | ৫,৬৬২ |
| ২০১১-১২ | ৬,১৪২ |
| ২০১২-১৩ | ৭,৫৬৯ |

***তথ্যসূত্র:*** এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৮ মে ২০১৩।

### পরিশিষ্ট ৪: এলজিইডি'তে প্রধান প্রকৌশলীদের তালিকা ও দায়িত্ব পালনের সময়

| প্রধান প্রকৌশলী | মেয়াদ | দায়িত্ব পালনের সময় |
|---|---|---|
| কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী | ৩১ আগস্ট ১৯৯২ – ১৬ মে ১৯৯৯ | ৬ বছর ৩ মাস |
| মু. মনোয়ার হোসাইন চৌধুরী | ১৬ মে ১৯৯৯ – ১৭ আগস্ট ২০০০ | এক বছর ৩ মাস |
| মু. আতাউল্লাহ্ ভূঁইয়া | ১৭ আগস্ট ২০০০ – ১০ ডিসেম্বর ২০০০ | ৪ মাস |
| মু. শহীদুল হাসান | ১০ ডিসেম্বর ২০০০ – ২৭ আগস্ট ২০০৮ | ৭ বছর ৪ মাস |
| মু. নুরুল ইসলাম | ২৭ আগস্ট ২০০৮ – ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ | ৪ মাস |
| মু. ওয়াহিদুর রহমান | ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ – বর্তমান | ৪ বছর ৩ মাস (চলমান) |

### পরিশিষ্ট ৫: সিজিএ কার্যালয়ে অর্থ ছাড়করণ প্রক্রিয়া

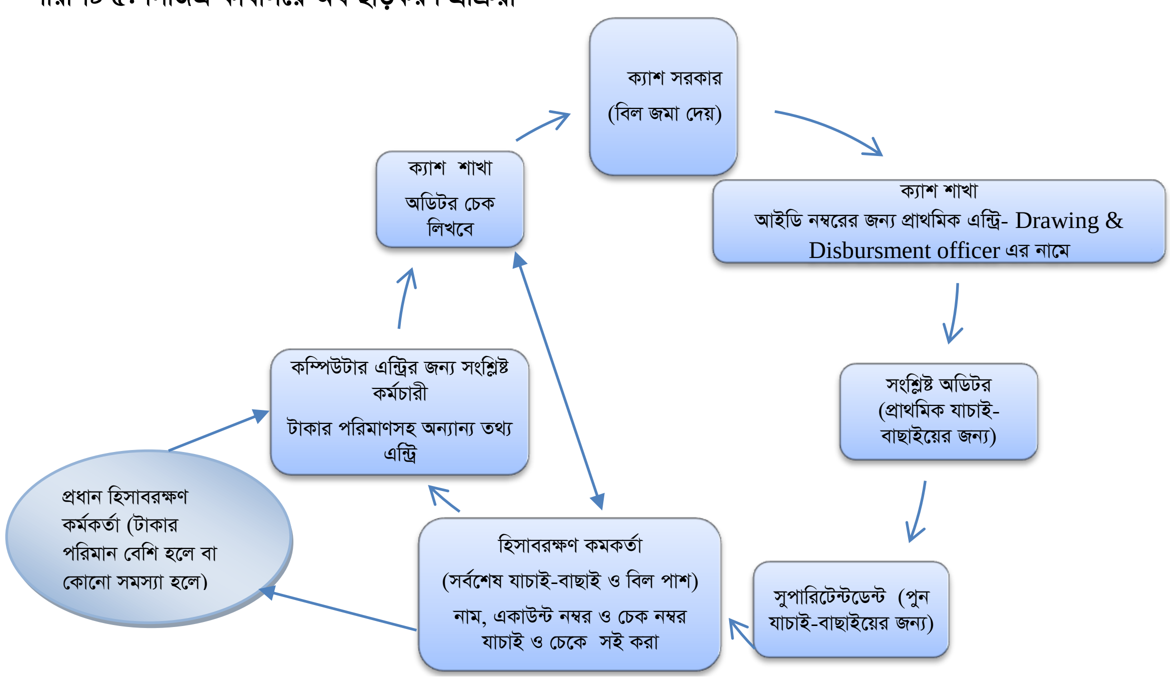

**পরিশিষ্ট ৬: পরিদর্শন দল কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা স্কিমের সংখ্যা**

| অর্থবছর | পরিদর্শন দল | স্থানীয় সরকার বিভাগ | এলজিইডি সদর দপ্তর | আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১১-১২ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ৩২৪ | ৪১৭ | ৮০৬ | ১৫৪৭ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ৩৯ | ১২৯ | ২৩৭ | ৪০৫ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ৩৬ | ১২৬ | ২৩৫ | ৩৯৭ |
| ২০১০-১১ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ২৬৫ | ৪৪৮ | ৭৮০ | ১৪৯৩ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ২৬ | ৮১ | ১৮৫ | ২৯২ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ২৬ | ৮১ | ১৮১ | ২৮৮ |
| ২০০৯-১০ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ১৩২ | ৬৫৭ | ৫৪৭ | ১৩৩৬ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ৩২ | ২৭১ | ১৪৯ | ৪৫২ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ৩২ | ২৬২ | ১৪৩ | ৪৩৭ |
| ২০০৮-০৯ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ১৪৫ | ৫৯৫ | ১২১৯ | ১৯৫৯ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ১০ | ২০৫ | ৪৩৬ | ৬৫১ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ৯ | ১৮৫ | ৩৬০ | ৫৫৪ |
| ২০০৭-০৮ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ৯৪ | ৩৮৮ | ১৭৮১ | ২২৬৩ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ১২ | ১৬৬ | ৮০৬ | ৯৮৪ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ১১ | ১০৯ | ৪৫৮ | ৫৭৮ |
| ২০০৬-০৭ | পরিদর্শনের সংখ্যা | ১৯৬ | ২১১ | ৮৩৭ | ১২৪৪ |
| | ত্রুটিপূর্ণ স্কিমের সংখ্যা | ৬০ | ১২০ | ২৭৮ | ৪৫৮ |
| | সংশোধিত স্কিমের সংখ্যা | ৫৯ | ৯৭ | ২২৮ | ৩৮৪ |

***সূত্র:*** এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৬ থেকে ২০১২।

**পরিশিষ্ট ৭: প্রকল্প পর্যবেক্ষণের বিবরণ**

# পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা

'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২০: অবকাঠামো, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা' শীর্ষক প্রকল্প ১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল একনেক-এ অনুমোদিত হয়। তবে ১৯৯২ সালে অনুমোদন হলেও মূল কাজ শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। এটি ছিল পাঁচ বছরমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য একটি প্রকল্প – পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে বাস্তবায়িত হতে মোট ১১ বছর ব্যয় হয়। ষষ্ঠতম সংশোধনের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালের ৩১ আগস্ট। বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনের কারণ নিম্নরূপ:

- ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার কারণে দেশের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব অবকাঠামো সংস্কারের ব্যয় এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়।
- মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দাবিতে প্রকল্পটি তৃতীয়বার সংশোধন করা হয়। এ সংশোধনে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় ২৬টি উপজেলা কমপ্লেক্স স্থাপন এবং অধিদপ্তরের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য কুমিল্লা ও চাঁদপুরে দুটো ফাংশনাল বিল্ডিং স্থাপন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- কৃষি উৎপাদনের বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে গ্রামীণ অবকাঠমো উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটিকে চতুর্থবারের মত সংশোধন করা হয়। একইসাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-কে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রকল্পটি পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করে। বিভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে আইডিবি ঋণ দেয়।
- ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যার কারণে বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি মেরামতের জন্য প্রকল্পটি পঞ্চমবারের মত সংশোধন করা হয়।
- বাংলাদেশি মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে বৈদেশিক অর্থের প্রেক্ষিতে টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যবহারের জন্য প্রকল্পটি ষষ্ঠবার সংশোধন করা হয়।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, গ্রোথ সেন্টার, রাস্তা, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ ও সংস্কারসহ আরও নানা ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে সর্বমোট ১০৮টি স্কিমের ওপর (প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত রয়েছে) পর্যবেক্ষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা করা হয়। নিচে পর্যবেক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন করা হল।

**ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কমপ্লেক্স**

এই প্রকল্পের আওতায় দশটি ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। গবেষণার আওতায় ছয়টি ইউপি কমপ্লেক্স পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, ছয়টির মধ্যে দুইটি কমপ্লেক্সের (কুমিল্লার পশ্চিম জোড়কানন ও চান্দের চর ইউনিয়ন) কাজ সম্পাদন হয়নি, তবে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সবগুলো ইউপি কমপ্লেক্স বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী দশটি ইউপি কমপ্লেক্সের জন্য বরাদ্দ ছিল তিন কোটি টাকা। এ হিসাবে একটি ইউপি কমপ্লেক্সের জন্য গড়ে বরাদ্দ ছিল ৩০ লাখ টাকা।

**সারণি ১: পরিদর্শনকৃত ছয়টি ইউপি কমপ্লেক্সের বিস্তারিত বিবরণ**

| ক্রম | ইউপি কমপ্লেক্সের নাম | উপজেলা | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| ১. | পশ্চিম জোড়কানন | কুমিল্লা সদর | ইউপি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়নি। বহুদিনের পুরানো একটি ভবনে ইউপি কার্যালয় অবস্থিত। যেখানে নতুন ইউপি কমপ্লেক্স তৈরি করার কথা ছিল সেখানে বর্তমানে স্থানীয় প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত দোকান তুলে দখল নিয়ে আছেন। ফলে এলজিইডি এখানে কখনো কাজ শুরুই করতে পারেনি। |
| ২. | চান্দেরচর-২ | হোমনা | চান্দের চরে কোনো ইউপি কমপ্লেক্স নেই। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাসায় বসে অফিস করেন এবং চান্দের চরে ইউপি কার্যালয় বানানোর কথা তিনি কখনো শোনেননি। |
| ৩. | জগন্নাথপুর | কুমিল্লা সদর | জগন্নাথপুর ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ শুরু হয় ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে। নির্মাণ শেষ হতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। যে ঠিকাদার এটি নির্মাণ করেন তিনি ইউপি কর্তৃপক্ষকে কোনো ধরনের হিসাব দেননি। ঠিকাদার কাজের শেষ পর্যায়ে লসের কথা বলে কাজ শেষ না করেই চলে যান। |
| ৪. | ১৬ নং বাইশগাঁও | লাকসাম | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটি ২০০৫ সালে বি.এন.পি. সরকার আমলে নির্মিত হয়েছে। ভবনটি |

| ক্রম | ইউপি কমপ্লেক্সের নাম | উপজেলা | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| | | | দুইতলা। মান ভাল। ভবনটি বাইশগাঁও ইউনিয়নের চিল্লা্যা গ্রামে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটি বাইশগাঁও থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। |
| ৫. | আশ্রাফপুর | কচুয়া | আশ্রাফপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয় ২০০১ সালে। প্রায় এক বছর ধরে এর কাজ চলে। ইউপি ভবনের মান ভাল। |
| ৬. | সহদেবপুর (পশ্চিম ও পূর্ব) | কচুয়া | পশ্চিম সহদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয় ১৯৯৬ সালে। পূর্ব সহদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে ও সমাপ্ত হয় ১৯৯৯ সালে। উভয় ইউপি ভবনের মান ভাল। |

**গ্রোথ সেন্টার**

এই প্রকল্পের আওতায় ৭৭টি গ্রোথ সেন্টার বাস্তবায়িত এবং উন্নয়ন করা হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে। গবেষণার আওতায় ৪৫টি গ্রোথ সেন্টার পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, ৪৫টির মধ্যে আটটি গ্রোথ সেন্টারের কাজ সম্পাদন হয়নি, তবে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সকল গ্রোথ সেন্টার বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, কিছু গ্রোথ সেন্টারের অবস্থা অনেক খারাপ। কোনো বিক্রেতা সেখানে বসে না। পিলারের আস্তরণ ঝরে পড়েছে, টিন পুরানো হয়ে ফুটো হয়ে গেছে, বৃষ্টির পানি পড়ে বসার স্থান অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো গ্রোথ সেন্টার সম্পর্কে এলাকাবাসী জানায় তারা এর নির্মাণকাজ নিয়ে অসন্তুষ্ট কারণ যতটুকু বড় বানানোর কথা ছিল তার তুলনায় অনেক ছোট করে বানানো হয়েছে কারণ নতুন গ্রোথ সেন্টারের জন্য বরাদ্দ অনেক জমি লিজ দেওয়ায় বাজারে বসার জায়গা অনেক ছোট হয়ে এসেছে। তাদের ধারণা এলজিইডি'র ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদারের সাথে মিলে গ্রোথ সেন্টারের টাকা মেরে দিয়েছে।

এছাড়া আইএমইডি'র প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী কুমিল্লা জেলায় ৩৫টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ/ উন্নয়নের সংস্থান ছিল। কুমিল্লা জেলার অগ্রগতি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে ২৬টি গ্রোথ সেন্টারের নির্মান বা উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ জেলায় অনুমোদিত অপেক্ষা নয়টি গ্রোথ সেন্টার কম নির্মান/উন্নয়ন করা হয়েছে। অথচ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে ৭৭টি (১০০%) গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ/ উন্নয়ন করা হয়েছে এবং আর্থিক ব্যয় ১০০%।[১] প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ৭৭টি গ্রোথ সেন্টারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১ কোটি টাকা হিসেবে একটি গ্রোথ সেন্টারের জন্য গড়ে বরাদ্দ ১৪ লাখ টাকার বেশি।

**সারণি ২: পর্যবেক্ষণকৃত আটটি গ্রোথ সেন্টারের বিস্তারিত বিবরণ**

| ক্রম | গ্রোথ সেন্টার | উপজেলা | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| ১. | রসুলপুর- ১ | কুমিল্লা সদর | ১৯৯৫-৯৬ সালের দিকে নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জমির মালিক জমি দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। |
| ২. | খোয়াইশ বাজার- ৩ | কুমিল্লা সদর | গ্রোথ সেন্টার নেই। একজন তথ্যদাতা জানান বহু বছর আগে একবার গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ হওয়ার কথা শুনেছিলেন তবে কেন তা নির্মাণ করা হয়নি সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি। |
| ৩. | আলাখের চর-৪ | কুমিল্লা সদর | গ্রোথ সেন্টার নেই। গ্রোথ সেন্টার যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেখানে এখন ধানের বাজার বসে প্রতিবছর। তথ্যদাতাদের মতে গ্রোথ সেন্টারটি দশ বছর আগে বানানোর কথা শোনা গিয়েছিল যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। গ্রোথ সেন্টার বানানোর নির্ধারিত স্থান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় বর্তমানে সেখানে বাস/গাড়ি মেরামত করা হয়। আর বাকি স্থান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। |
| ৪. | রঘুনাথপুর-৫ | কুমিল্লা সদর | গ্রোথ সেন্টার নেই। তথ্যদাতাদের মতে তারা কখনো গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের কথা শোনেননি। |
| ৫. | মুন্সীরহাট-৬ | লাকসাম | গ্রোথ সেন্টার নেই। নতুন করে গ্রোথ সেন্টার বানানো হবে যার নির্মাণসামগ্রী আনা হচ্ছে। গ্রোথ সেন্টার বানানোর নির্ধারিত স্থানে বর্তমানে খোলা বাজার বসে। |
| ৬. | যুক্তিখোলা-৭ | লাকসাম | গ্রোথ সেন্টার নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে মেঝে পাকা করে টিনের ছাউনি দিয়ে নিজেদের বসার স্থান তৈরি করে নিয়েছে। বাজার কমিটির সদস্যের সাথে কথা বলে জানা গেল তিনি গ্রোথ সেন্টার বানানো হবে এ বিষয়ে কিছু জানেন না। |
| ৭. | ভুশ্চিবাজার - ৮ | লাকসাম | গ্রোথ সেন্টার খুঁজে পাওয়া যায়নি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় নির্ধারিত স্থানে নতুন গ্রোথ |

[১] বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০০৯-১০।

| ক্রম | গ্রোথ সেন্টার | উপজেলা | পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| | | | সেন্টার বানানো হচ্ছে যা তথ্য সংগ্রহের সময় অসমাপ্ত ছিল। আগে কখনো কোনো গ্রোথ সেন্টার বানানো হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে এলাকাবাসী জানায় এরকম কোনো উদ্যোগ আগে কখনো নেওয়া হয়নি। |
| ৮. | বালিয়াহাট | কুমিল্লা সদর | গ্রোথ সেন্টার নেই। উল্লিখিত স্থানে নিজ উদ্যোগে ব্যবসায়ীরা ছোট-ছোট ছাউনি বানিয়েছে। |

**গ্রামীণ সড়ক**

বেশিরভাগ সড়কের মান অত্যন্ত খারাপ। স্থানে স্থানে পিচের কার্পেটিং উঠে গেছে। স্থানে স্থানে পিচ উঠে রাস্তায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যা বর্ষাকালে যাতায়াতে অনেক সমস্যা করে বলে জানায় স্থানীয় জনগণ। বিভিন্ন স্থানে সুরকি উঠে গেছে, যার ফলে রাস্তা অসমান হওয়ায় যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটে। স্থানীয় জনগণ জানায়, নির্মাণের পর সড়কগুলোর বড় ধরনের কোনো সংস্কার করা হয়নি। সংস্কার করা হলেও এক/দেড় মাসের বেশি গুণগত মান ঠিক থাকে না এবং যথাযথ পরীক্ষণ করা হয় না। সড়কের মান নিয়ে স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতে, রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন করা হয়েছে কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি। যেসব রাস্তা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আবাসস্থলের নিকট সেসব রাস্তা প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা নিজ উদ্যোগে মাটি ভরাট করে সড়কের মান ধরে রেখেছে বলে জানায় স্থানীয় জনগণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাস্তার মান ভাল তবে প্রশস্ততা কম হওয়ায় সমস্যা হয়। উল্লেখ্য, বছর পাঁচেক আগে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম কয়েক কিলোমিটার রাস্তা ভাঙ্গা। রাস্তার ধার দুপাশেই ভেঙ্গে গেছে, কার্পেটিং উঠে গেছে। উপরন্তু অসমতল রাস্তার প্রশস্ততা কম হওয়ায় মাঝারি আকারের যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয়। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার পরের রাস্তা তুলনামূলক ভাল।

**অনুমোদন-বহির্ভূত স্কিম বাস্তবায়ন**

কুমিল্লা জেলায় ২৬টি গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে চারটি গ্রোথ সেন্টার অনুমোদিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন ছাড়া ডিপিপি-বহির্ভূত স্কিম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও আইন পরিপন্থী।[২]

**প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পুলে জমা না দেওয়া**

মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী প্রকল্পের অধীনে মোট ছয়টি জীপ ও ১৬টি মোটর সাইকেল প্রকল্প সমাপ্তি শেষে নিয়মানুযায়ী সরকারি যানবাহন পুলে জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। এসব যানবাহন বর্তমানে এলজিইডি'র বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিপি সংশোধন, অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং ব্যয় বৃদ্ধি**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় পাঁচ বছর। পরবর্তীতে পাঁচ দফায় প্রকল্পটি সংশোধনের ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১১ অর্থবছর ব্যয় হয় যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ছয় বছর বেশি। অন্যদিকে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ১২৫.৯৫ কোটি টাকা থেকে পাঁচ দফায় সংশোধনপূর্বক ৩৪০.৬৫২ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়, এবং জুন ২০০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৩৩১.৯৭১৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় থেকে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৬.০২১৩ কোটি টাকা (১৭০.৪৬%)। আইএমইডি'র মতে, "যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে এর যেমন বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো অন্যদিকে এর সুফল জনগণ সঠিক সময় থেকেই ভোগ করতে পারত"।[৩]

**ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া**

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত রাজস্ব খাতে টাকার পরিমাণ ২৭২.৯৬৬৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ সরকারি খাতে প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা ৪.১৮০১ কোটি টাকা অতিরিক্ত ছাড় করা হয়েছে। অতিরিক্ত ছাড়কৃত অর্থ বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি।[৪]

---

[২] *প্রাগুক্ত।*

[৩] *প্রাগুক্ত।*

[৪] *প্রাগুক্ত।*

**পরিশিষ্ট ৮: ঠিকাদারের বিল অনুযায়ী সিজিএ কার্যালয়ে ঘুষের হার**

| **বিলের পরিমাণ** | **ঘুষের হার** |
|---|---|
| ১ লক্ষ টাকার মধ্যে | ৫%-১০% |
| ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে | ১%-১.৫% |
| ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে | ০.৫০%-১% |
| ২০ লক্ষ টাকার ওপরে | ০.২০%-০.৫০% |
| ঈদ/পূজার সময়ে (যে কোনো বিলে) | সর্বোচ্চ ১০% |
| মে-জুন মাসে (যে কোনো বিলে) | ৫%-১০% |

**উৎস:** রায় (২০১২)।